শাহাজাদার নাম ভূমিকায়

তের বাঙ্গুর এভিন্যু, কলকাতা পঞ্চান্ন

প্রথম প্রকাশ ২৫ জানুয়ারী ১৯৫৯ প্রকাশক
ভারতী দত্ত 'পুষ্প' প্রযত্নে ঘোষ লাইব্রেরী ১৩ 'বি' ব্লক, বাঙুর . এভিন্যু কলকাতা - ৫৫। মুদ্রণ হেমপ্রভা প্রিনটিং হাউস ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলি-৯

।। এক।।

নির্বাসিতের কথা

ফজরের নামাজ শেষ হল। বাইরে বেরিয়ে এলেন ইব্রাহিম খাঁ। খাঁ সাহেবের আস্তানাটি ছোট। সামনে এক চিলতে উঠোন। উঠোনে এসে পা রাখলেন খাঁ সাহেব। মাথার ওপর আশমান। গাছগাছালির ভেতর থেকে এখন আলোর তরঙ্গ খেলছে। অদূরে পাহাড়ি গড়। গড়ের মাথায় কয়েকটি আলোর ফনা এসে হানাদারি সেরে গেল। এই মুহূর্তে উঁচু উঁচু গাছগুলির চেহারা বদলেছে। মাথায় তাদের সোনালি তাজ। —চারদিক ঘিরে আরম্ভ হয়েছে পাখির কলতান। সকালটি ভারি মনোরম।

এরকম সকাল দেখতে কে না ভালবাসে? —খাঁ সাহেবও বাসতেন। দিল্লির শাহী মসজিদের ফাঁক দিয়ে সূর্যের লাল গোলাটা যখন লাফিয়ে উঠে পড়ত পাকুড় গাছের মাথা বরাবর, তখন সে দৃশ্য দেখে ইব্রাহিম খাঁয়ের দিল খুশির জোয়ারে ভাসত। ইদানীং ব্যাপারটা একেবারেই উল্টো হয়ে দাঁড়িয়ে। —রোশনাই, হাওয়া, স্নিগ্ধতা, শান্তি,— এ সব তিনি একেবারেই সহ্য করতে পারেন না। বছর বারো ধরে এই তাঁর অনুভূতি।

সকালের আলো ফুটলেই তিনি নিজের মনে বিড় বিড় করতেন। কসম করতেন এ ভাবে এক একটা দিনকে নিষ্ফলা যেতে দেওয়া হবে না। যাঁরা তাঁর কলিজা ছিঁড়ে নিয়েছেন, তাঁদের তিনি সাজা না-দিয়ে ছাড়বেন না। তিনি নিজে একজন বিচারক। কাজী।

ইব্রাহিম খাঁ বরাবরই ছিলেন একরোখা। জেদী। মা-বাপ্ ভাই-বেরাদর কারোকেই তিনি কখনো পরোয়া করতেন না। নিজে যা বুঝতেন, খাঁ সাহেব নিজের সেই বোঝাতে অটল থাকতেন। পরের কথা কখনও কানে নিতেন না। ইসলামি শাস্ত্রে তিনি ছিলেন বরাবরই সুপণ্ডিত। ভড়ংবাজ মোল্লা-মৌলবিদের তিনি একেবারেই সহ্য করতে পারতেন না। নিজের জীবনেও তিনি বেশ সংযমী ছিলেন। ইসলামি অনুশাসন খুব কঠোরভাবে পালন করতেন খাঁ সাহেব। জীবনে কখনও তিনি শরাব পান করেন নি।

নাচ-গানের মজলিসেও তিনি কখনও হাজিরা দেন নি। শাদি করার ব্যাপারেও বিস্তর দ্বিধা ছিল তাঁর।

তিনি ছিলেন রোগা, দীর্ঘদেহী। কাঁচা সোনার মতো ছিল তাঁর রঙ। এক মুখ দাড়ি। সোজা হয়ে হাঁটতেন। বছর তিরিশ-বত্রিশ পর্যন্ত এক ভাবেই কাটিয়েছিলেন। তিরিশ-বত্রিশের পরেই ছন্দপতন। কেল্লা থেকে হঠাৎ একদিন ওই সময়ে এক তলব এল খাঁ সাহেবের কাছে। পড়ন্ত বিকেল। মক্তবে বসে একটি আরবি কেতাব পড়ছিলেন ইব্রাহিম খাঁ। এক অশ্বারোহী খোজা এসে থামল মক্তবের দরজায়।

'জনাবকে এত্তেলা পাঠিয়েছেন কাজী-উল-কাজাত।' খোজা সৈনিকটি একটু থামল। দম নিল। তারপর বলল: 'কাল সকালে কী জনাবের কেল্লায় যাওয়া সম্ভব হবে? যদি সম্ভব হয়, তাহলে কাজী-উল-কাজাত জনাবের জন্য কেল্লার সেরেস্তায় অপেক্ষা করবেন।'

এ রকম একটি অভাবিত সংবাদে কিছুক্ষণের জন্য ইব্রাহিম খাঁ থম্ খেয়ে গেলেন। তাঁর মতো একজন সামান্য ব্যক্তিকে কাজী-উল-কাজাত কেন স্মরণ করেছেন?

ইব্রাহিম তাঁর হাতের কেতাব বন্ধ করে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বললেন, 'হুজুর কাজী-উল-কাজাতকে আমার আদাব। কাল সুবাতেই এ বান্দা হুজুরে হাজির হয়ে যাবে।'

তা যথাসময়েই পরের দিন হাজির হয়েছিলেন ইব্রাহিম। কাজী-উল-কাজাত তাঁর বিস্তর প্রশংসা করেছিলেন। পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলেছিলেন, 'আমি তোমার মতো এক সাচ্চা আদমি খুঁজছিলাম। সৎ আর নির্ভীক আদমি পেটের বিদ্যেটাও অবশ্য ঠিকমত থাকা চাই। শাহী বিচার তামাসা হয়ে যাচ্ছে। এ সব অনাচার ঠেকাতে তোমার মতো আদমি দরকার। তোমাকে আমি মহল্লার কাজী করে দিচ্ছি।'

পরের দিন থেকেই যমুনার এ-পার বরাবর বিশাল এক মহল্লার বিচারকের দায়িত্ব পেয়ে গেলেন খাঁ সাহেব। দায়িত্ব এবং গণ্ডগোলের সেই শুরু।

ইব্রাহিম না-দেখে শুনে কোনও বিচার করতেন না। মাঝে মাঝে তাঁকে মহল্লায় বের হতে হত সরেজমিন তদন্ত করতে। ধনীর দৌলতখানা থেকে সাধারণ গরিবখানা সর্বত্রই। এই ভাবে ঘোরাঘুরি করতে গিয়ে একদিন নিজেই ফেঁসে গেলেন। দুঃস্থ একটি মেয়েকে তিনি শাদি করে ফেললেন। মা-বাপ নেই। অনাথিনী বালিকা। অথচ দেখতে শাহাজাদীর মতন সুন্দরী। এ ধরনের মেয়েদের বিপদ লেগে থাকে পায়ে পায়ে। গড়াতে গড়াতে এরা নেমে যায় আস্তাকুড়ে।

উঠোনে পায়চারি করতে করতে খাঁ সাহেব একবার উঠে এলেন দাওয়ার ওপর। সামনেই দরজা-ভেজানো ছেলের ঘর। জওয়ান বখ্ত থাকে এই ঘরে। ছেলেটার চলাফেরা একেবারেই পছন্দ নয় তাঁর। ছেলেটার না-আছে বিদ্যে, না বুদ্ধি। ইসলামি আচার-আচরণের এক কণাও ধার ধারে না। গাছের লতা-পাতা যেভাবে বাড়ে, সেইভাবে বড়ো হচ্ছে জোয়ান বখ্ত। দিনে দিনে চেহারাখানা খুব খোলতাই দিচ্ছে। গায়ে গতরে শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে। বাপের মতন পেয়েছে আড়া। — বেতের মতো নির্মেদ দীর্ঘ চেহারা। মায়ের মতো পেয়েছে ঢলো ঢলো লাবণি। চোখ দুটো বড়ো বড়ো। দেখতে দখতে বয়সটা আঠারো-উনিশ হয়ে গেল। ছেলেটা বাপের দুচক্ষের বিষ। বাপের ধারণা, বদ

নসিব নিয়ে ছেলেটার জন্ম। নইলে তাদের এমন হা-ভাতে অবস্থা হবে কেন? ছেলেটাকে একসময় খাঁ সাহেব আদর করে ডাকতেন; 'জোয়ান বখ্‌ত'। এখন ডাকেন 'কমবক্ত।' তবে ছেলেটা খাটিয়ে। সংসারের পক্ষে কাজের। মেলা কাম করে।

চারদিকে আলো ফুটে উঠেছে। এত বেলা পর্যন্ত তো ছেলেটা ঘুমোয় না। ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে, তাহলে ছেলেটা করছে কী। টেনে দরজাটা খুলে দিলেন হাট করে। যা আন্দাজ করেছিলেন, তা মিলে গেল। ছেলেটা আলো ফোটবার আগেই নেমে গেছে নিচে।

নেমে গেছে জ্বালানি কাঠ আনতে। নয়ত নিচের ঝোরা থেকে পিনে কা পানি। এ পাহাড়ে ওপরের দিকে যেমন ওঠা যায়, নিচেও তেমনি নামা যায়। ওপরে উঠতে হয় কাঠ কাটতে। নিচে নামতে হয় জল আনতে। এ ওঠা-নামা কমবক্তটাই করে। ইব্রাহিম খাঁ গত বারো বছরে একবারের জন্যও ওপরে ওঠেন নি। তবে মাসের ভেতর চার পাঁচদিন তাঁকে নিচে সমতলভূমিতে নেমে যেতে হয়। পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে মাওয়ালিদের বাস। ছোট ছোট পল্লী। আর পাঁচটা পাহাড়ি জাতির মতো মাওয়ালিরাও কর্মঠ। কষ্ট সহিষ্ণু। এবং সাহসী। তীরন্দাজিতে এদের সঙ্গে এঁটে ওঠা কঠিন। কাঠবেড়ালির মতো এরা পাহাড়ের জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়। জঙ্গলের মধু, জঙ্গলের ফল আর পাহাড়ি বকরি এদের অনেকখানি খিদে মেটায়। রঙ একটু কালো বটে, কিন্তু মাওয়ালি পুরুষদের চেহারায় খাটি মরদের ভাব আছে। মেয়েরা বড় সরল। নিখুঁত তাদের শরীরের গঠন।

মাওয়ালিরা খাঁ-সাহেবকে খাতির করে। দেখা হলেই ওদের পাহাড়ি রীতিতে তসলিম দেয়। অবশ্য ওদের এই খাতির জানানোকে পরোয়া করেন না ইব্রাহিম। তিনি পাকদণ্ডী বেয়ে আরও নিচে নেমে যান। পাহাড়ের নিচে সমতলভূমিতে মাঝারি ধরনের একটি মুসলমান অধ্যুষিত লোকালয় আছে। মসজিদ আছে। মাজার আছে। আর ছোটোখাটো মক্তব আছে। আর তার পাশেই আছে ছোটো একটি কোতয়ালি। সঙ্গে সুলতানের হুকুম মোতাবেক একটি বিচারালয়। ঢেঁকি যেমন স্বর্গে এসেও ধান ভাঙে, কাজী ইব্রাহিম খাঁ তাঁর এই নির্বাসিত জীবনে এই ছোট্ট মুলসমান পল্লীতে এসে মাসে চারপাঁচদিন বিচারকের সিংহাসনে বসেন। বিনিময়ে বিজাপুরের সুলতানি থেকে কিছু মাস-মাহিনা পান। সেই তংকায় বাপ-বেটার জীবিকা নির্বাহ হয়।

এই ভাবেই দেখতে দেখতে বারোটা বছর কেটে গেল।

জোয়ান বখ্‌ত এখন প্রায় জোয়ান। তার স্মৃতিতে এখনও দিল্লির কেল্লা, রাস্তাঘাট, কিছু মানুষ জনের ছবি ভেসে ওঠে। আবছা আবছা মায়ের মুখটা মনে পড়ে। আর দিদিকেও খুবই মনে পড়ে। সবাই কেমন যেন হারিয়ে গেল। কেন হারাল, কোথায় হারাল, তা জোয়ান বখ্‌ত জানে না। আর

কেনই-বা বাপ্‌জান দিল্লি ছেড়ে এখানে এল, সে জবাবও নিজের ভেতর খুঁজে পায় না জোয়ান বখ্‌ত। এখানে এসে হাজির হওয়ার কয়েক-মাস পরে ভেতরের রহস্যটা জানতে চেয়েছিল সে বাপ্‌জানের কাছে। উত্তর ঠিক মতো পাওয়া যায়নি।

'আব্বাজান? আমরা বরাবর এই জঙ্গলেই থাকব? আর দিল্লি ফিরে যাব না?'

'না, দিল্লি ফিরে যাবার মতলব আর আমার নেই। শাহী আস্তাকুড় থেকে জঙ্গল অনেক ভাল। যে মুলুকে বিচার নেই, অপরাধের শাস্তি নেই, সে মুলুকে ফিরে গিয়ে কী হবে?'

'দিদির খোঁজ করবে না?'

'খোঁজ করতে হবে তোকে।'

'আমাকে? এ জঙ্গল থেকে পথ চিনে আমি বের হতেই পারব না।' জোয়ান বখ্‌তের চোখে মুখে ফুটে উঠেছিল কেমন যেন এক অজানা ভয়।

'পারবি। পারতেই হবে। অপরাধের শাস্তি চাই। সে শাস্তি কাজী-উল-কাজাত না দিলে তোকেই দিতে হবে।'

'এই জঙ্গলে বসেই?'

'না, তখন তোকে দিল্লি যেতে হবে।'

'দিল্লি!'— বেচারি জোয়ান বখ্‌ত হতাশ হয়ে পড়ে। 'আমি একা দিল্লি যাব? কবে?'

'দেরি আছে।— দেরি আছে।'

শাদির কয়েকদিন পরে ইব্রাহিমের তলব এল কাজী-উল-কাজাতের দপ্তর থেকে। সব রকম কাম-কাজ ফেলে রেখেই ইব্রাহিম খাঁকে দৌড়ুতে হয়েছিল বড় কাজীর সঙ্গে দেখা করতে। তখন দিল্লিতে শেষ বসন্ত। হা-হা গরম। ঘোড়া ছুটিয়ে ইব্রাহিম খাঁ এলেন কাজী-উল-কাজাতের দরবারে।

'হুজুর আমার কাছে জবর তবল পাঠিয়েছেন?

তুমি আব্দুল ওয়হাব বোরার নাম শুনেছ?

'শুনেছি'। খুব গম্ভীর বলেছিলেন ইব্রাহিম খাঁ। 'এক সময় তিনি ছিলেন বাদশা ঔরংজেবের খুব পেয়ারের লোক। হজরত তাঁকে ভালবেসে তাঁর আজমের পহেলা পর্বে কাজী-উল-কাজাত করেছিলেন। তিনি নিজে বিস্তর মোকদ্দমার ফয়সালা করেছিলেন। নিজের কুঠিতেই তিনি আদালত বসাতেন।'

'তিনি কি খুব সৎ লোক ছিলেন?'

'না বরং ষোলো বছর তামাম সাম্রাজ্যের কাজী হয়ে বিস্তর টাকা কামিয়েছিলেন বলে শুনেছি। দামি দামি আসবাব, হিরে-মণি মুক্তো ঐসব বাদ দিয়ে নগদে তিনি তেত্রিশ লাখ টাকা কামিয়েছিলেন।'

'দেখছি তুমি সবই জানো। ওঁর ছেলে শেখ্-উল-ইসলামের খবরও নিশ্চয়ই জানা আছে।

'আছে জনাব। অমন বাপের এমন ছেলে কী করে হয়, তা ভাববার আছে। বাপের খারাপ পথে রোজগারের টাকা একদিনের তরেও তিনি ছুঁলেন না। দান আর খয়রাতি করে বিলকুল সব টাকাটা তিনি উড়িয়ে দিলেন। পাপের পয়সায় তিনি হাত দিলেন না। তা জনাব, আমাকে এসব কথা শোনাবার জন্য তলব দিয়ে ডেকে আনিয়েছেন?'

কাজী-উল-কাজাত তাঁর সাদা দাড়িতে আঙুল চালাতে চালাতে হেসে বললেন, 'এসব কথা শোনবার আর শোনাবার বটে, কিন্তু তোমাকে ডেকেছি অন্য কারণে। তুমি নাকি শাদী করেছ? আর বিবিটি নাকি খুব সুরৎ?"

'নিজের বিবিকে সব আদমিই সুন্দরী দেখে।'

'কোনও মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করতে গিয়ে এ শাদী করেছ? বাদী বা ফরিয়াদীর সঙ্গে বিবির আত্মীয়তা আছে?'

'না। আমি এক গরিব মুসলমানের ঘর থেকে বিবিকে তুলে এনেছি। এর মধ্যে কোনও বদ মতলব নেই। বাদী বা বিবাদীর প্রসঙ্গ একেবারেই আসে না।'

'হুম, স্বস্তিবোধ করলেন কাজী-উল-কাজাত। 'এখন দেখছি, যা শুনেছিলাম, তার সবটাই মিথ্যে। বিলকুল রটনা। মিথ্যে রটনা আগুনের থেকেও দ্রুত ছড়ায়। তবে ঘর সামলে রাখতে হয়।'

'ঘর সামলাব ?'

'তোমার কাছারি আর মকান দুইই বদল করতে হবে। শাহী মহল্লার ভেতর তোমার থাকবার মতো একটি কুঠি ঠিক করে দিচ্ছি। আর তোমার কাছারি হবে দিল্লির পুব দিকের বসত। এখানকার বেশির ভাগ লোকই তোমার অচেনা। নিরপেক্ষ বিচারে তোমার কোনও অসুবিধা হবে না।

'বেশ, হুজুর আমার জন্য নতুন কুঠি আর কাছারির ব্যবস্থা করুন। আজ ব্যবস্থা হলে, কালই আমি পুরনো মহল্লা ছেড়ে চলে আসব।'

সেই হা-হা গরম। দিল্লির শেষ বসন্ত। নতুন পাতার উদয় হচ্ছে। ঠা-ঠা দুপুরে ঘোড়া ছুটিয়ে কুঠিতে ফিরে এলেন ইব্রাহিম খাঁ। স্বামীর অপেক্ষায় হাঁ করে কুঠির ভেতর বসে জিন্নৎ ঘরবার করছিল। স্বামী ফিরে আসাতেই সে ঝাঁপিয়ে পড়ল 'হজরত! তোমার জন্য আমি যে ছটফট করছিলাম। এত দেরি হল কেন? তোমার কি কোনও বিপদ হয়েছিল?'

'না, বিপদ হয়নি। তবে হতে পারত।'

'হতে পারত?' শঙ্কা আর বিস্ময়ে জিন্নতের চোখদুটি বিস্ফারিত হল, 'যে আমাদের বিপদ বাধাতে চায়, তার মুখে আমি লাথি মারি।'

বিপদের মুখে লাথি মেরেই শাদির পর বছর চোদ্দ-পনেবো সুখেই কাটিয়ে গেল সে। নতুন কুঠি আর নতুন কাছারিতে এসে ইব্রাহিমেরও অনেক পরিবর্তন হল। তার নিজের ভেতর যে এক অনমনীয় কাঠিন্য ছিল সেটা একটু একটু করে নমনীয় হতে থাকল। ইব্রাহিম বাবা হলেন।

প্রথমে হল একটি মেয়ে। আনারের কলির মতো সুন্দরী। মেয়ের জন্মের দশ বছর পরে মায়ের কোলে এল জোয়ান বখ্‌ত। ততদিনে মেয়ে বেশ ডাগর হয়ে উঠেছে। দশ বছরের মেয়েকে দেখে বোঝা যাচ্ছিল যে সৌন্দর্যে সে মাকে ছাড়িয়ে যাবে। বোঝা যাচ্ছিল যে সে বেগম মহলের বেগমদেরও টেক্কা দিতে পারে। এদিকে ইব্রাহিম খাঁয়ের তেমন খেয়াল ছিল না। খাঁ সাহেব তখন বুঁদ হয়ে মেতে আছেন কাছারি নিয়ে। কখনও ফৌজদারি বিচার করছেন, কখনও দেওয়ানি। কারও জরিমানা হুকুম করছেন। কারও করছেন বেত্রাঘাতের। বাদশা নিজে এক সময় কঠোর ছিলেন অপরাধীদের ওপর। শাহী সড়কে খুন ও রাহাজানির জন্য পাঁচশ দস্যুকে তিনি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেছিলেন। বাদশা নিজেই সে কানুন শিথিল করছেন। বেত্রাঘাত বা হাজতবাসের সাজা দিয়ে তাঁদের প্রাণ বাঁচানো হচ্ছে। বাদশা নিজেই ফতোয়া দিচ্ছেন। 'ফতোয়া-আলমগিরি' কেতাবটি খুব মনোযোগ দিয়ে পড়তে থাকেন ইব্রাহিম খাঁ। পড়তে পড়তে বুঝতে পারেন যে পাথর ছুঁড়ে অপরাধীকে আর খতম করা কঠিন হয়ে যাচ্ছে। হাত-পা কেটে সাজা দেওয়ার অমানবিক রীতি ক্ষীয়মাণ। তবে অপরাধীর মুখে কালী দিয়ে, মাথা নেড়া করে শাহী পথে ঘোরানো অনায়াসেই চলে।

চোখের ওপর দিয়ে চলে যায় একটির পর একটি ঋতু। ছেলে মেয়ে বড় হয়ে উঠছে, খেয়ালই নেই। জিন্নৎ সংসার চালায়, কোনও দায় দায়িত্বই বহন করেন না ইব্রাহিম খাঁ। খাঁ সাহেবের একটি বান্দা আছে। সে করে সংসারের বাইরের কাজ। আর এক বাঁদী আছে, সে জিন্নতের ফাই ফরমাশ খাটে। দেখভাল করে ছেলে মেয়েদের। মাঝে মাঝে সে আবার গান শোনায় জিন্নতকে।

ঐ দু'জন ছাড়া আর একজনকে খেয়াল করতে পারেন ইব্রাহিম খাঁ। ঐ তৃতীয়জন হলেন রতন চাঁদ বেনিয়া। শাহী মহল্লায় রতন চাঁদের রয়েছে বিরাট এক গোলদারি দোকান। সেই দোকান থেকে মেলা মালপত্তর আসে খাঁ সাহেবের। মশলা পাতি। তেল নুন, চাল। সব। হুজুরের সংসারে মাল সরবরাহ করে রতন চাঁদ যেন কৃতার্থ। খাঁ সাহেবকে দেখলেই সে কুর্নিশ করে। মাথার ছোট্ট টুপিটা খুলে ফেলে সম্মান জানায়। আর মুখে থাকে বিগলিত হাসি। রতনচাঁদ বেনিয়ার কথা ভালই মনে করতে পারেন ইব্রাহিম।

জীবনেব এই সময়টা ভালই কেটেছিল খাঁ সাহেবের। কিন্তু আল্লাহ সম্ভবত ইব্রাহিমের এই সুখ চাননি। তাই তিনি নিজের হাতেই খাঁ সাহেবের

ঘরের চেরাগ এক ফুঁয়ে নিভিয়ে দিলেন। বিসূচিকা রোগে হঠাৎ মারা গেল জিন্নৎ। সংসারে পড়ে রইল এক হতভাগ্য স্বামী। পঞ্চদশী একটি মেয়ে আর পাঁচ বছরের একটি অসহায় বালক। দাঁত থাকতে লোকে দাঁতের মর্যাদা বোঝে না। জিন্নৎ বিবিকে গোর দিয়ে আসার পর থেকে হর রোজই খাঁ সাহেব টের পেতে থাকলেন জিন্নতের অভাব। সংসারে শুরু হয়ে গেল ছুঁচোর কেত্তন। প্রথমে চপ্পল হারানোর পালা। পরে শুরু হল চুরি। ঘরের ভিতরে সুরক্ষিতভাবে থাকা সত্ত্বেও হারিয়ে যেতে থাকল শৌখিন জিনিস পত্তর। আতর, সুর্মা, রুপোর কাঁটা, পায়ের অঙ্গোট, গোড়বালা, রুপোর চিরুনি প্রথম পর্যায়ে হারিয়ে গেল। দ্বিতীয় পর্যায়ে হারিয়ে গেল ইব্রাহিমের কয়েকটি দামি কেতাব। কিশোরী আনারকলির কয়েকটি দামি দামি পোশাক হাওয়া হয়ে গেল। গোলাম-বাঁদি কেউই এর হদিশ দিতে পারল না। এরপর হেঁসেলে 'ইঁদুর' ঢুকল। চাল ঘি গেঁহু লবঙ্গ এলাচ, মায় পেঁয়াজ রসুন পর্যন্ত 'ইঁদুরের' খাদ্য হয়ে উঠল। এই সব উৎপাতে আতঙ্কিত হয়ে খাঁ সাহেব তাঁর কুঠির পুরনো বাঁদি আর বিশ্বস্ত নোকরকে বিদায় দিয়ে স্বস্তি পেতে চাইলেন। পুরনো নোকর তাড়িয়ে দিয়ে নতুন নোকর রাখা হল। আর রাখা হল একটি ঠিকে বাঁদি। সে রান্না করে দিয়ে চলে যায়।

এই নতুন ব্যবস্থায় খানিকটা স্বস্তি পেলেন বটে, কিন্তু কিছুদিন যেতে-না-যেতেই আরেক উটকো বিপদের মুখোমুখি হলেন।

ইব্রাহিম খাঁয়ের কুঠির সামনে বেশ খানিকটা খোলা মাঠ। গরমের দুপুরে এ মাঠ খাঁ খাঁ করে। জোৎস্না রাতে এই মাঠটিকে স্বপ্নের মতোমনে হয়। এ মাঠটি দক্ষিণ দিকে প্রসারিত হয়ে যমুনায় গিয়ে মিশেছে। অদূরে মুঘল দুর্গ। লালকেল্লা, শীতের দুপুরে এ মাঠে মাঝে মাঝে তাঁবু পড়ে। মুঘল বংশের ছেলেপুলেরা অশ্বারোহণের মহড়া দেয়।

কিন্তু এবার দেখা গেল, মুঘল বংশের তরুণ ছোকরাদের নজর পড়েছে কন্যা আনারের ওপর। কুঠির ছাদে উঠে আনার তাদের ক্রীড়া কৌশল দেখে। আর ক্রীড়া কুশলীরা মাঠ থেকে দেখে আনারকে। — আনারের রূপ, তার দীঘল চোখের দিঠি, হাওয়ায় উড়ে যাওয়া তার কেশ গুচ্ছ আবিষ্ট করে ছোকরা মুঘলদের। মাতিয়ে তোলে তাদের। মাঠের ওপর দিয়ে তারা ঘোড়া ছুটিয়ে সোজা চলে আসে খাঁ সাহেবের কুঠি বরাবর। অছিলা করে ঢুকে পড়ে ভেতরে। এসব যখন ঘটে তখন কাছারিতেই ব্যস্ত থাকেন ইব্রাহিম খাঁ। সুতরাং কিছুই টের পান না তিনি।

অসময়ে একদিন কুঠিতে ফিরে এই গোলমাল প্রথম টের পেলেন। দেখলেন তাঁর কুঠির সামনে ঘোড়া বাঁধা। বাড়ির উঠোন পেরিয়ে নিঃশব্দে তিনি ভেতরে এসে ঢুকলেন। দেখলেন, মুঘল বংশীয় দুই যুবক হা-হা করে হাসছে। তারা বসে আছে দাওয়ায়। আর ঘরের ভেতর খিল আটকে বসে

কাঁপছে কিশোরী কন্যা আনার। আর তার পাঁচ বছরের ছোট ভাই জোয়ান বখ্ত। নব নিযুক্ত নোকরটি অনুপস্থিত। ইব্রাহিম খাঁকে দেখে কেমন যেন চুপসে গেল সেই অচেনা দুই যুবক। একটি কথাও বলল না। পিছু হাঁটতে হাঁটতে তারা দৌড়ে পালিয়ে গেল।

বিকেলের দিকে দেখা হল বেনিয়া রতন চাঁদের সঙ্গে।

'হজরত। আপনার তবিয়ত কি ভাল নেই?' —রতন চাঁদ উদ্‌বেগ প্রকাশ করল, 'মুখটা যেন শুকনো লাগছে।'

'তবিয়ত ভাল আছে। মন ভাল নেই।' —হাসল ইব্রাহিম খাঁ, মুঘল বংশের কয়েকটি ছোকরা কুঠিতে ঢুকে পড়ে গোলমাল বাধাচ্ছে।'

'জানি হুজুর।'

'জানো?' বিস্মিত হলেন ইব্রাহিম খাঁ।

'জি। চোখের সামনেই দেখি। দেখেই বোঝা যায় এদের মতলব ভাল নয়।'

'তুমি এদের নাম বলতে পারবে? কেবল এদের নাম নয়, এদের বাপের নামও আমার চাই, পারবে?

'পারব। তবে দু'চারদিন সময় চাই।

'রতন ভাই, আরেকটা ব্যাপারে সাহায্য করতে হবে যে। —আমার একটি শক্তপোক্ত বিশ্বাসী লেঠেল নোকর চাই, পাওয়া যাবে?'

পাওয়া যাবে। তবে সে মুসলমান হবে না হুজুর। এক জাঠ ছোকরা আমার জানা আছে। ব্যাটা হিঁদু। আমার কাছে হামেশাই আসে। তাকে যদি রাখা যায়, তা হলে সে জানকবুল করে কুঠি পাহারা দেবে।'

'হিঁদুতে আমার আপত্তি নেই।'

ব্যবস্থা বদলে ভালই ফল পাওয়া গেল। জাঠ লেঠেল সারাক্ষণ কুঠি পাহারা দেয়। ব্যাটার তাগরাই শরীর। হাঁড়ির মতন মুখ। মুখে আবার এক জোড়া মোটা গোঁফ। হাবশি পাহারাদারদের থেকেও ভয়ঙ্কর। মুঘল ছোকরাদের আর ধারে কাছে পাওয়া গেল না। তারা মাঠের অপর প্রান্তে ঘোরাঘুরি করে। ঘোড়া ছোটায়। তীরন্দাজি করে। গোলমালটা যেন সামলে গেল।

ফাল্গুনের বসন্তে কালবৈশাখী আঁচ করা যায় না। ডাকাতের মতোসে আসে অতর্কিতে।

ইব্রাহিম খাঁয়ের জীবনে সেই কাল বৈশাখীর ডাকাতিটাই হয়ে গেল। সেদিন সন্ধ্যার মুখে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। একটু ঝড়ও হয়েছিল! কিছু শুকনো পাতা খসে পড়েছিল পথের ওপর। গোলাপ-বাগানে বিস্তর পাপড়ি খসে পড়েছিল। কাছারি থেকে খাঁ সাহেবের ফিরতে দেরি হয়ে গেল। ঘোড়া ছুটিয়ে খাঁ সাহেব যখন কুঠিতে ফিরলেন তখন চারদিকে

থমথমে অন্ধকার। তাঁর নিজের কুঠি নিষ্প্রদীপ। ছ্যাৎ করে উঠল বুকের ভেতরটা।

অন্ধকারের মধ্যেই তিনি এগিয়ে গেলেন পায়ে পায়ে। ভেতরে ঢুকেই কানে শুনলেন টানা গোঙানির শব্দ। আবছা আলো-আঁধারিতে যা দেখলেন, তা বড় ভয়ঙ্কর। জাঠ পাহারাদারটি তার বিশাল শরীর নিয়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে। দরজার মেঝের ওপর চাপ চাপ রক্ত।

কাঁপা কাঁপা হাতে কোনও রকমে তিনি চেরাগ জ্বালালেন। জ্বালানোর পরেই টের পেলেন যে তাঁর সর্বনাশ হয়ে গেছে। জাঠ পাহারাদারটির মাথায় গভীর ক্ষত। বর্শার খোঁচায়। তার মৃত্যু আসন্ন। ঘরগুলি দরজা হাট করে খোলা। খিল ভাঙা। ঘরের ভেতর থেকে কোনও জিনিস চুরি যায়নি বটে, কিন্তু সব জিনিসই ছত্রাকার। বিছানা লণ্ডভণ্ড। চাদর গদি তোশক, সবই এলোমেলো। বিছানায় এক পাশে বালিশ আঁকড়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে জোয়ান বখ্‌ত।

কিন্তু কোথায় গেল আনার কলি। খাঁ সাহেবের কলিজা। বুঝতে অসুবিধা হল না, দস্যুরা তাকে অপহরণ করে নিয়ে পালিয়ে গেছে। মাথায় হাত দিয়ে মেঝের ওপরই বসে পড়লেন খাঁ সাহেব। মনে হল, এখনই তিনি তাঁর জ্ঞান হারাবেন। জিন্নতের শোক বুকে চেপে রেখে তিনি যাদের নিয়ে বাঁচতে চেয়েছিলেন তাদের এ কী হল? তাঁর আনার কলি পশুর খাদ্য?

ইব্রাহিম হঠাৎ তরাক করে লাফিয়ে উঠলেন। ঘরে থেকে বেরিয়ে এলেন উঠোনে। উঠোন থেকে বাইরে। পথে।

নির্জন পথ। খাঁ খাঁ। কৃষ্ণপক্ষ। ইব্রাহিম খাঁ ঝড় তুললেন এসে বেনিয়া রতন চাঁদের দোকানে। দোকান বন্ধ। তবে দোকানসংলগ্ন কুঠিতেই থাকে রতন চাঁদ। হাঁকাহাঁকিতে বেরিয়ে এল বেনিয়া রতন। তার মাথায় একটা পট্টি। ডান হাতটা উঁচু করে বাঁধা গলার কাছে তুলে। রতনের দিকে ভাল করে তাকিয়েও দেখলেন খাঁ সাহেব।

'রতন। ভেইয়া।' মাত্র দুটি শব্দ উচ্চারণ করতে-না-করতেই গলা ভেঙে গেল কান্নায়, 'এমন সর্বনাশ কে করল ভেইয়া। কে?' খাঁ সাহেবের গলা ভরে গেল কান্নায়।

'ডাকু।'

'শাহী মহল্লায় ডাকু এসে ঢুকেছিল? এ মহল্লার চারদিকে চৌকি। তিনটে কোতোয়ালি। জোরে হাঁক মারলে বিশটা সেপাই এক মুহূর্তে দৌড়ে আসে। সেখানে সকলের চোখের সামনে ডাকুরা এসে আমার পাহারাদারকে খুন করে মেয়েটাকে চুরি করে নিয়ে গেল!'

'আজ্ঞে, আপনি হক কথাই বলেছেন হুজুর! এ ডাকাতির রহস্য যারা বোঝেনি, তারাই বোকার মত রুখে দাঁড়াতে গিয়েছিল। এই রতন চাঁদ সেই

বোকাদের দলে পড়ে। আমার জানটা যায়নি হুজুর! তবে মাথায় চোট লেগেছে। আর ডান হাতটা জখম হয়েছে। এ মহল্লার এরকম আরও পাঁচ দশ জনের হয়েছে, জনাব!'

'শাহী রক্ষীরা এগিয়ে আসেনি?'

'আজ্ঞে না। শাহী মদতে যদি ডাকাতি হয়, তারা কেন আসবে হুজুর। এ তো সাজানো খেলা!'

'শাহী মদত! সাজানো খেলা! তার মানে শাহাজাদাদের এ কাণ্ড?'

'জি। প্রথমের দিকে ঠাহর হয়নি এ ধোঁকাবাজির খেলা। ভেবেছিলাম এ সব কাণ্ড পাঠান ডাকুদের। দিল্লি শহরের বাইরে পাঠান ডাকুরা ইদানীং এরকম দু'চারটে কাণ্ড করেছে। তাই তেড়েমেরে রুখতে গেলাম শেষে যখন হাত ভাঙল আর মাথার ওপর চোট পেলাম, তখন ধোঁকাবাজির ধোঁয়া কেটে গেল।'

'কে সেই বেয়াদপ, নাম করতে পারো, রতন চাঁদ!'

'পারি। তবে হুজুরের দোহাই। এ বান্দার নাম যেন কোনরকমে ফাঁস না হয়। ফাঁস হলেই, এ বান্দাও বিলকুল খতম হয়ে যাবে।'

'ভয় নেই। নাম বলো। তোমার নাম কখনও প্রকাশ পাবে না।'

এ সব কাণ্ড যিনি বাধিয়েছেন, তিনি হলেন বাদশার নাতি ফারুক আর তার দলবল।'

'আমার মেয়ে কি সেই খতরনাক শয়তানটার কাছে আছে?'

'আজ্ঞে, চালান না করে দিলে, আনার কলি মাব তেনার কাছে থাকাই সম্ভব!'

'তুমি কি নিশ্চিত?'

'শতকরা দুশো ভাগ।'

আর কথা বাড়ালেন না ইব্রাহিম খাঁ। যেভাবে টলতে টলতে তিনি বেনিয়া রতন চাঁদের কাছে গিয়েছিলেন, সেইভাবেই ফিরে এলেন তাঁর কুঠিতে।

সকালে উঠেই দৌড়েছিলেন খাঁ সাহেব। হাজির হলেন কাজী-উল-কাজাতের দরবারে। বুড়ো অবাক হয়ে বললেন তোমার ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে!'

'জি। আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে। সর্বনাশ যারা করেছে, সেই সব অপরাধীদের বিচার চাই!'

'বটে! তা তোমার সর্বনাশটা কী ধরনের হয়েছে, সেটা খুলে বলো বিচার নিশ্চয় হবে। অপরাধীরা কেউই সাজা এড়াতে পারবে না।'

'আমার কিশোরী কন্যা অপহৃত হয়েছে। শয়তানরা তাকে হয়তো ছিঁড়ে খুঁড়ে খাচ্ছে! আমার কুঠির একটা জাঠ পাহারাদারকে খুন করে তারা আমার মেয়েকে নিয়ে পালিয়েছে। আমি আমার হারানো মেয়েকে ফেরৎ পেতে

চাই। আর চাই অপরাধীর শাস্তি। চরমদণ্ড।'

বৃদ্ধ কাজী-উল-কাজাত এ ভয়ঙ্কর খবরটি শোনামাত্র উত্তেজিত এবং বিচলিত হয়ে উঠলেন। তাঁর কাশফুলের মতন সাদা দাড়িতে ঘন ঘন আঙুল চালাতে চালাতে বললেন, 'শাহী মহল্লায় এত বড় একটা ঘটনা ঘটে গেছে। অথচ আমি এর কিছুই জানি না! তাজ্জব ব্যাপার?' বৃদ্ধ কাজী জ্বলে উঠে বললেন, 'তোমার যারা সর্বনাশ করেছে, সেই ইবলিশদের তুমি চেনো?'

'চিনি।'

'কী নাম বলো? আমি এখনই ব্যবস্থা নিচ্ছি।'

ইব্রাহিম খাঁ থেমে থেমে বলছেন, 'শাহাজাদা ফারুক আমার মেয়েকে চুরি করে এনেছে। জনাব, আপনি পারবেন তার কবল থেকে আমার মেয়েকে উদ্ধার করে দিতে? পারবেন তার অপরাধের উপযুক্ত শাস্তি দিতে? পারবেন?'

বৃদ্ধ কাজি যে-ভাবে দপ্ করে জ্বলে উঠেছিলেন ইব্রাহিমের অভিযোগ শুনে, এখন ইব্রাহিমের কথায় প্রায় সেই ভাবেই খপ্ করে নিভে গেলেন। তাঁর সতেজ গলা মিইয়ে গেল। ভাঙা ভাঙা গলায় কাজী-উল-কাজাত বললেন, 'শাহাজাদা ফারুক এ কাজ করল? হা আল্লাহ্। ব্যাপারটা তল্লাশ করে দেখতে হবে। কিন্তু তল্লাশই বা কী করে করব? যতদূর জানি, সন্ধ্যার কিছু পরে শাহাজাদা ফারুক দিল্লি ছেড়ে চলে গেছেন।'

'দিল্লি ছেড়ে চলে গেছে? কোথায়?

'বাঙ্লা মুলুকে। বাদশা আলমগীরের নতুন ফরমান অনুসারে বাঙলা মুলুক দেখভালের দায়িত্ব পেয়েছে শাহাজাদা ফারুক। শহাজাদা করিমের ওপর বর্তেছে বিহার শরীফ দেখবার দায়িত্ব। নিজের নিজের দায়-দায়িত্ব বুঝে নিতে সকলেই এক পায়ে খাড়া। শাহাজাদা ফারুক সেই জন্যই বাংলা মুলুকে চলে গেছেন।'

'বিচারের জন্য হজরত কি শয়তান শাহাজাদাকে তলব করে আনতে পারেন না?'

'পারি না।' মিনমিনে গলায় বললেন বৃদ্ধ কাজী, 'এ কাজ যিনি পারেন তিনি হলেন বাদশা স্বয়ং। আর এই অপরাধের বিচারও তাঁর দ্বারাই করা সম্ভব— এদের বিচার করা তোমার আমার এক্তিয়ারে পড়ে না ইব্রাহিম। তোমার জ্বালা আমি বুঝতে পারছি, কিন্তু বুঝতে পারলেও আমার হাত-পা বাঁধা।'

আনারকে হারিয়ে ফেলার পর দেড় মাস পর্যন্ত খাঁ সাহেব ভাবনার একই অন্ধ অলিন্দে পাক খেয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন। কোনও পথ পান নি।

বেনিয়া রতন চাঁদ একদিন খাঁ সাহেবের কুঠিতে এল হুজুরের সঙ্গে দেখা করতে। হুজুরের তবিয়ত খারাপ। দিনে দিনে চেহারাটা শীর্ণ হয়ে যাচ্ছে।

চোখের কোলে জমেছে কালিমা। দাড়ি পেকে গেছে আধা আধি। বেবাক বদলে যাচ্ছেন হুজুর।

'কী ঠিক করলেন হুজুর? স্বয়ং বাদশার কাছে আর্জি জানাচ্ছেন না কেন?'

'বাদশা? বাদশা আলমগীর এখন থাকেন দক্ষিণদেশে। আহমদ নগরে। দিল্লিনগর থেকে সাতদিনের পথ। এই পথ একা একা আমার পক্ষে পাড়ি দেওয়া সম্ভব? সঙ্গে রয়েছে আবার আমার ছোট ছেলেটা।' ইব্রাহিমের মুখ বুকে ঝুলে পড়ে। 'আর আমি যদি আপনার যাওয়ার ব্যবস্থা করি?'

'তা হলে কালই আমি দক্ষিণদেশে বাদশার কাছে চলে যাই।' নতুন উৎসাহে দপ করে জ্বলে উঠলেন ইব্রাহিম খাঁ। —আমি দুশমনদের বিচার চাই।

বেনিয়া রতন চাঁদ তার কথা রেখেছিল। দক্ষিণের দেশ থেকে সেই সময় এক মুসলমান বণিক এসেছিলেন দিল্লিতে। তাঁর নাম মীর্জা আবদুল। উত্তরের দেশ থেকে সওদা করে তিনি চলেছিলেন দক্ষিণেই। তাঁর সঙ্গে ছোটখাটো আরও কয়েকজন সওদাগর ছিল। তাঁদের সঙ্গে ছিল গোটা দশেক উট। গোটা বারো খচ্চর। পাঁচজন অশ্বারোহী। রক্ষী। রসুইকর। কুকুর। কয়েকটি তাঁবু। আর প্রচুর সওদা। এঁদের সঙ্গে ইব্রাহিম খাঁকে ভিড়িয়ে দিলেন রতন চাঁদ। ছোট্ট জোয়ান বখ্‌ত চলল উটের পিঠে চড়ে। খাঁ সাহেব চললেন নিজের ঘোড়ায় চড়ে। পিছনে পড়ে রইল রাজধানী দিল্লি। শৈশব ও যৌবনের একান্ত পরিচিত মানুষজন। বেগম জিন্নতের সমাধি। পরিচিত জন পদ ছেড়ে অনিশ্চিত এক অচেনা মুলুকের দিকে পা বাড়ালেন খাঁ সাহেব।

এভাবে কখনও পথ চলেননি খাঁ সাহেব। এভাবে কখনও দেখেননি হিন্দুস্থানকে। এক মুলুক ছাড়িয়ে যখন আরেক মুলুকে ঢোকেন, তখন সেই ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই হিন্দুস্তানের নতুন নতুন রূপের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। এখন দিনের বেলাকার বাতাস গরম হতে আরম্ভ করেছে। কোথাও কোথাও পথের দুধারে শস্য ভরা ক্ষেত। কোথাওবা সবে শস্যকাটা শেষ হয়েছে। দক্ষিণগামী পথ যে কেবল ফসল ভরা খেতের ভেতর দিয়েই গেছে, তা নয়। কোথাও কোথাও এ পথকে বুকে নিয়ে বসে আছে রুক্ষপ্রান্তর। ধু ধু মাঠ।

এপথ চলতে চলতেই একদিন চোখে পড়ল আরাবল্লী পাহাড়ের ধোঁয়াটে শীর্ষ রেখা। আধভাঙ্গা চাঁদ উঠল ঐ পাহাড়ের অবরোধ টপকে। আরও কয়েকদিন পরে পথে পড়ল জঙ্গল। একদিনের জন্য বিশ্রাম। মীর্জা আবদুল খাঁ-সাহেবকে বললেন, 'পথ আর বেশি নেই জনাব? আশা করি দিনদুইয়ের ভিতর আমরা ফতেনগর পৌঁছে যাব। সম্ভবত ওখানেই হুজুরের সঙ্গে বাদশার দেখা হয়ে যাবে।'

'ফতেনগর? কই, এমন নাম তো কখনও শুনিনি? শুনেছি বাদশা থাকেন ঔরঙ্গাবাদে। ফতেনগর এল কোথা থেকে?'

'বাদশা ঔরঙ্গাবাদেই থাকেন। এখন আমরা যাকে ঔরঙ্গাবাদ বলছি, আগে এর নাম ছিল 'ফতেনগর'। ওই ফতেনগর নামটি দিয়েছিলেন মালিক অম্বর। প্রথম জীবনে বাদশা যখন সুবেদার হয়ে এই দক্ষিণদেশে আসেন তখন ফতেনগর নাম তিনি বদলে দিলেন। বদলে নতুন নামকরণ করলেন। ঔরঙ্গাবাদ। অবশ্য এই জায়গাটার আরও একটা পুরনো নাম ছিল। 'খিড়কি'।'

'বাদশা কি কখনও দৌলতাবাদে ছিলেন না? শুনেছি দৌলতাবাদের গড় খুব পাকাপোক্ত।'

'হ্যাঁ, দৌলতাবাদের গড় খুবই মজবুত। শাহী প্রাসাদও খুব জমকালো। তবে বাদশা ঔরংজেব এসব কিছুই পছন্দ করেন না। শুনছি ইদানীং তিনি ঔরঙ্গাবাদের প্রাসাদেও থাকেন না। থাকেন খুলদাবাদে। নগর ঔরঙ্গাবাদের থেকে একটু পশ্চিমে। জায়গাটির নতুন নামকরণ হয়েছে, আহমেদ নগর।'

'বটে। —তা আমরা সেখানে গেলেই কি বাদশার দেখা পাব?'

'পাবেন।' মীর্জা আব্দুল আশ্বস্ত করলেন ইব্রাহিমকে।

মীর্জা সাহেব ঠিক কথাই বলেছিলেন। কিন্তু যার নসিব মন্দ, তাকে বাঁচায় কে?

তাপ্তী নীদর ওপর দিয়ে শীতল বাতাস প্রবাহিত হয়ে আসছে। ক্লান্ত শরীরের অবসাদ কাটিয়ে দিচ্ছে। ভারি আরাম। আরামে দু'চোখ বুজে আসছিল খাঁ সাহেবের। আর একটু পরেই হয়তো দু'চোখ ভরে ঘুম নামত। হঠাৎ দমকা একটি কোলাহলে ঘুম ভেঙে গেল। আরামের শয্যা ছেড়ে তেড়েমেরে উঠে বসলেন ইব্রাহিম খাঁ। উঠে বসেও কিছু ঠাহর করতে পারলেন না। ধীর পায়ে এগিয়ে গেলেন।

'কী হয়েছে, মীর্জা ভাই! আপনাদের খুব উদ্‌বিগ্ন দেখাচ্ছে। কোনও দুঃসংবাদ আছে নাকি?'

'হ্যাঁ, এ সংবাদ, দুঃসংবাদই বটে? এই মাত্র খবর পেলাম হিন্দুস্তানের বাদশার এন্তেকাল হয়েছে।'

তাপ্তী নদীর তীরে সেই অপরাহ্নবেলায় খাঁ সাহেবের তাঁবুতে আস্ত একটি কামানের গোলা যদি এসে পড়ত, তাহলেও এতখানি তিনি চমকে উঠতেন না।

'মীর্জা ভাই। কে আপনাকে এখবর এনে দিল? আমার মনে হয়, এখবর মিথ্যা।'

'না হুজুর। এমন ভয়ঙ্কর খবর কখনও মিথ্যা হয় না। তাছাড়া, ওই দেখুন নদী পার হয়ে একদল অশ্বারোহী সেপাই চলেছে রাজধানী দিল্লি-আগ্রার পথে। —আশঙ্কা করছি, কয়েক ঘণ্টার ভেতরই গোলমাল বেধে যাবে। দস্যুরা আর লুটেরারা ঝাঁপিয়ে পড়বে সাধারণ গেরস্থর ওপর। গ্রামে-গঞ্জে শহরে-নগরে সর্বত্র গোলমাল বেধে যাবে।'

এরপর 'তখ্‌ত' দখল নিয়ে মুঘল সন্তানদের ভেতর যে কামড়া-কামড়ি শুরু হবে তার ছবি প্রকট হয়ে উঠল ইব্রাহিমের মনে। বাতাসে তিনি বারুদের গন্ধ পেলেন। কানে শুনলেন তরবারির ঝন্‌ঝনি। ছুটন্ত ঘোড়ার খুরের শব্দ। বহু আর্তচিৎকার। খাঁ সাহেব খুঁজে পেলেন না তাঁর ইতিকর্তব্য।

মীর্জা আব্দুল অভিজ্ঞ পোড়খাওয়া মানুষেরমতোস্বগতোক্তি করে উঠল। 'কাল সকাল হতে-না-হতে আমি এ নদী পেরিয়ে পশ্চিমে হাঁটা দেব। তবে পশ্চিমের পথ ধরবার আগে হুজুরকে আহমদনগরের শাহী সড়কটা চিনিয়ে দেব। ওই সড়ক ধরে এগিয়ে গেলে হুজুর দেড় দিনের মাথায় পৌঁছে যাবেন শাহী ছাউনিতে। সঙ্গী হিসেবে সড়কে বিস্তর লোক পাবেন।'

মাথার ভেতরটা ভোঁ ভোঁ করছে। কোনও ভাবনাই খাঁ সাহেবের মনের ভেতর সেঁধতে চাইছে না। সাঁঝের আশমানেরমতোইবিলকুল সব ঝাপসা। হঠাৎ তারা ফোটার মতন ঝিকমিকিয়ে উঠল একটি জিজ্ঞাসা। হিন্দুস্তানের বাদশার কাছেই তো আমার অর্জি। আমার ফরিয়াদ। তা তেনারই যদি এন্তেকাল হয়ে থাকে, কার কাছে খাঁ সাহেব ফরিয়াদ জানাবেন। কে বিচার করবে তাঁর অভিযোগের।

মীর্জা ভাই। আমি তোমার মুলুকে যেতে চাই। আমার কোনও সাকিন নেই। আস্তানা নেই। মাথা গোঁজবার মতন কোনও ঠাঁই নেই। আমার এই ছেলেটাকে নিয়ে দুনিয়ার যে কোনও প্রান্তে আমি যেতে রাজি আছি।' ইব্রাহিম ডুকরে উঠলেন।

এর পরের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত। মীর্জা আবদুলের হাত ধরেই ইব্রাহিম খাঁ এসে হাজির হয়েছেন কোঙ্কন প্রদেশের এই পাহাড়ি এলাকায়। এ এমনই একটি মুলুক যেখানে মুঘল শাসন প্রায় একেবারেই নেই, অথচ এ এলাকাটি মুঘল সুবার ভেতরে। মারাঠারা হল এখানকার তরফদার। মারাঠাদের অশ্বারোহী সেনারা এ অঞ্চলে ঢুকে নিয়মিত চৌথ আর সরদেশমুখী আদায় করে নিয়ে যায়। মারাঠাদের হাতে এটুকু তুলে দিতে পারলে আর কোনও ঝামেলা থাকে না। এরা মুঘল-পাঠান বোঝে। কিন্তু হিন্দু মুসলমান নিয়ে মাথা ঘামায় না। ফলে হিন্দুরা যেমন তাদের ধর্ম বিশ্বাস নিয়ে, গণেশ আর শিবঠাকুর নিয়ে, দিব্যি হেসে খেলে আরামে আয়াসে দিন কাটাতে পারে, তেমনি মুসলমানরাও পারে তাদের মসজিদ-মাজার-মক্তব নিয়ে জীবন কাটাতে। মীর্জা আব্দুল এই পাহাড়ের নিচে বড় একটি গঞ্জের ভিতর ব্যবসা চালায়। গঞ্জটি মুলসমান অধ্যুষিত। এই লোকালয়েই কাজীর কাজ পেলেন ইব্রাহিম খাঁ। ইসলামী আইনে তিনি মুসলমানদের বিচার করেন। সাজা দেন। আবার সাজা মুকুবও করেন। মীর্জা আবদুলই তাঁর এই কাজটি জোগাড় করে দিয়েছেন। এজন্য মীর্জার প্রতি তিনি কৃতজ্ঞ। তা কৃতজ্ঞতাটুকু খাঁ সাহেব বছরের পর বছর নিজের মনে বহন করে আসছেন। নইলে কোনও সভ্য

মানুষকে তিনি সহ্য করতে পারেন না। সমতল ভূমি থেকে কয়েক হাজার ফুট উঁচুতে এই নিবিড় জঙ্গলের ভেতর নিজেকে নির্বাসিত করে রেখেছেন।

কিন্তু দুনিয়া থেকে নিজেকে আড়াল করতে চেষ্টা করলে কী হবে, দুনিয়ার টুকিটাকি খবর ফাঁক ফোকর দিয়ে চলে আসে হামেশাই। এই পাহাড়ি জঙ্গলে বসেই তিনি শুনেছেন শাহী মসনদের জন্য শাহাজাদাদের সংঘর্ষের কথা। খবর পেয়েছেন তিনি শাহাজাদা আজমের মৃত্যুর। হায়দ্রাবাদের কাছে এক লড়াইয়ে শাহাজাদা কামবক্‌সও খতম্ হয়ে গেলেন। শাহাজাদা মুয়াজ্জম নিষ্কণ্টক হয়ে তখ্‌তে বসলেন। কিন্তু এ বসাইবা কত দিনের? বুড়ো বয়সে সুখভোগ আর সহ্য হল না। বছর চার পাঁচের ভেতর এন্তেকাল। এরপরে মুয়াজ্জমের চার ছেলের ভেতর কামড়া-কামড়ি শুরু হল। অল্পদিনের ভেতর তিনজনকে খতম করে জহান্দর শা তখ্‌ত দখল করলেন। তা যেমন বাদশা, তেমনি তাঁর উজির। বাদশা মেতে উঠলেন এক নাচনি বিবিকে নিয়ে। এঁদের কেচ্ছায় দিল্লি তোলপাড়। উজির জুলফিকার দু'হাতে টাকা লুঠতে থাকলেন। অল্পদিনের ভেতর বাদশা খুন হলেন। এবার মসনদে এসে বসলেন সেই ফারুক, আনারকে যে লুঠ করেছিল।

নিচে নেমে এসেছিলেন সেদিন ইব্রাহিম খাঁ। মীর্জাই তাঁকে এই খবর জানাল।

'হিন্দুস্তানের বাদশা হয়েছে ফারুক। ফারুক শিয়র?'

'জি'।

যে আগুন এতদিন ছাইচাপা ছিল, ইন্ধন পেয়ে সে আগুন আজ জ্বলে উঠল দপ্ করে। ইব্রাহিম খাঁয়ের চোখ দুটি যেন আগুনের ভাটা। তাঁর চোখমুখের আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটল। গলার স্বরটা ভেঙে গেল। খাঁ সাহেব কাঁপতে থাকলেন থর থর করে। শুধু বলতে পারলেন 'কী করে?'

'আজ্ঞে, উনি কি আর নিজের শক্তিতে তখত পেয়েছেন! ওঁর পিছনে রয়েছেন দুই সৈয়দ ভাই, হাসান আর হুসেন। হিন্দুস্তানে এমনকোনওমানুষ নেই যে তেনাদের বুদ্ধির সঙ্গে এঁটে উঠতে পারে। ভারি সাফ্ মাথা। তখ্‌তে বসেই নতুন বাদশা এঁদের একজনকে করেছেন কুতুব-উল-মুলুক, আরেকজনকে করেছেন আমির-উল-উমারা। প্রধানমন্ত্রী ও প্রধান সেনাপতি। এঁদের দুই কাঁধে ভর দিয়ে হিন্দুস্তানের বাদশা হেঁটে চলেছেন নির্ভয়ে।

জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কেমন যেন আনমনা হয়ে গিয়েছিলেন ইব্রাহিম খাঁ। গাছপালা ছাড়িয়ে মাথার ওপর উঠে পড়েছে সূর্য। ফজর পেরিয়ে গেছে। এই ভাবেই খসে পড়ছে একটির পর একটি দিন। খসে পড়েছে বেগম জিন্নৎ! হারিয়ে গেল আনার কলি। জংলী মাওয়ালিদের ভেতর পাহাড়ি যুবকদেরমতোমানুষ হয়ে উঠছে জোয়ান বখ্‌ত। এই ভাবেই দেখতে দেখতে এগিয়ে চলেছে দুনিয়া। কিন্তু খাঁ সাহেবের বুকের জ্বালা কমছে কই?

।। দুই ।।
বালা ভাট

নদীর এক কূল ভাঙলে, গড়ে উঠে আরেক কূল। এ হল মহাকালের কানুন। এ কানুন নড়চড় হবার নয়।

বেশ ক'বছর ধরেই হাজামজার খেলা চলছে মুঘলদের ভেতর। ভাঁটার টানে পড়লে নদীর যে হাল হয়, অনেকটা সেই রকম হাল। চারদিকে খিক্‌থিকে কাদা। পা ডুবে যায়। এদিকে আবার পাড় ভাঙছে। শ দেড়েক বছর ধরে ওঁরা যেভাবে হিন্দুস্তানের বুকে হম্বি তম্বি করে বেড়িয়েছেন, এখন সেই শক্তি নেই।

মুঘল শক্তি না হয় ধসে পড়ল, ভাঙল, কিন্তু গড়ে উঠছে কে? নদীর কোন্ কূলেতে চর জাগছে।' বনের রাজা সিংহ দুর্বল হয়ে পড়লে, শেয়ালের প্রতাপ বাড়ে। ভেকের দল হাতির মতো চলাফেরা করে। এই নিরিখে দেখলে ভারত ইতিহাসের এ সময়ে মারাঠাদের বাড়বাড়ন্ত হবার কথা! কয়েক দশক আগে বিস্তর ঢাক ঢোল পিটিয়ে রায়গড়ে মারাঠা শিবাজীর যে অভিষেক হয়েছিল, সে অভিষেক কি কেবল ব্যক্তি শিবাজীর? সে অভিষেক কি তামাম মারাঠা জাতির নয়?

'আমরা ফুরিয়ে গেছি না কি?' বিশাল গড়ের নিভৃত মন্ত্রণা কক্ষে এক নিশিথ রাতে ফিস্‌ফিসিয়ে কথাটি বললেন রাজা শাহু। 'মুঘলদের ভেতর এখন ভাঙাভাঙি আরম্ভ হয়ে গেছে। আমরা স্রেফ হাত গুটিয়ে বসে থাকব?'

বিশাল গড়ের এই মন্ত্রণা কক্ষে সে রাতে তেমন বেশি লোকজন ছিল না। ছিলেন আটপ্রধানের ভেতর মাত্র তিন। ছিলেন দরিব, যিনি প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন। ছিলেন সেনাপতি। আর ছিলেন যিনি, তিনি হলেন বালাজী ভাট। শাহুজীর প্রধানমন্ত্রী। এই মন্ত্রণাকক্ষের প্রধান পুরুষ বালাজী ভাট গম্ভীর। চেরাগের আলোয় সে রাতে আরও বেশি গম্ভীর লাগছিল।

মারাঠারাজ শাহুজী রাজসিংহাসনে বসে থাকলেও ঈষৎ ঝুঁকে তাকালেন বালাজীর দিকে। 'কী, ঠিক বলিনি পেশোয়াজি।' এমন মওকা আমাদের ছেড়ে দেওয়া উচিত? দিল্লির দিকে আমরা একবারের জন্যই দৃষ্টি ফেরাব না?'

বালাজী ভাট যেমন গম্ভীর ভাবে বসেছিলেন, ঠিক সেই ভাবেই বসে রইলেন। বালাজী চিন্তিত। অন্যমনা। উজিরের এই নীরবদা, এই নীরব উপেক্ষা, সাধারণ কোনও রাজা হলেহয়তোবরদাস্ত করতেন না। কিন্তু শাহুজী নিজের চরিত্র সম্পর্কে সচেতন। তিনি আর পাঁচজন রাজারমতোদাপুটে নন। তিনি আবেগপ্রবণ। তাছাড়া রাজা হতে গেলে শৈশব থেকে যে সব শিক্ষা তাঁর গ্রহণ করা উচিত ছিল তা তিনি পাননি। তা ছাড়া মারাঠাদের রাজা হওয়া

রীতিমত কঠিন। রাজ্য পরিচালনার অনেক অলি-গলি জানতে হয়। অনেক ঝুঁকি নিতে হয়। নজর রাখতে হয় নিয়মিত রাজস্ব সংগ্রহের ওপর। শাহুজী এ সব ব্যাপারে অনভিজ্ঞ।

তবে আনাড়ি লোকেরাও অনেক সময় হঠাৎ বড় একটা কিছু করে ফেলে। হয়তো না বুঝেই করে। পরে দেখা যায়, সেই কাজটি তাঁকে বাঁচিয়েছে। তা শাহুজীর জীবনে এই রকম একটি বড় কাজ করার ঘটনা ঘটে গেল। মুঘলদের বন্দীশালায় বছরের পর বছর আটক থেকে শাহু যেদিন নিজের রাজ্যে ফিরে এলেন, তার কিছুদিন পরেই তাঁর সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল এক উদ্ভট মানুষের । সেই মানুষটিই তাঁর জীবনের বড় আবিষ্কার। মহত্তম কীর্তি।

মানুষটির চেহারায় তেমন কোনও চটক নেই। মাঝারি ধরনের উচ্চতা। সাদামাটা দেখতে। বাজপাখির ঠোটেরমতোমানুষটির নাক দীর্ঘ। বাঁকা। চোখ দুটি উজ্জ্বল। গায়ের রঙ্ কালো। চেহারায় বলিষ্ঠতার ভাব। গলায় মালা। সেনাপতি ধনাজী যাদবের অতিথি ছিলেন সেবার শাহুজী। ধনাজী যাদব বিস্তর আপ্যায়ন করেছিলেন শাহুজীকে। খানাপিনার পর শাহুজী যখন সেরেস্তায় এসে বসলেন তখন পরিচয় হল এই বিচিত্র ও উদ্ভট মানুষের সঙ্গে।

'ছত্রপতি শাহুজী। আপনি এই অধম নোকরের নমস্কার গ্রহণ করুন। আপনি দীর্ঘজীবী হোন। ঈষৎ নত হয়ে একটি মানুষ নমস্কার জানান।

নোকরের গলায় এক গাছা পইতা রয়েছে মনে হচ্ছে। লোকটি তাহলে ব্রাহ্মণ? শাহুজীর ভ্রূ-যুগল ঈষৎ কুঞ্চিত হল।

'আপনাকে ব্রাহ্মণ বলে মনে হচ্ছে! —আমার অনুমান কি সত্য?

'মহারাজের দৃষ্টি দেখছি খুবই প্রখর। কিছুই এড়িয়ে যায় না। —আমি এই কোঙ্কনের চিৎ পাবন গোষ্ঠীর ব্রাহ্মণ।

'মহাশয়ের নাম?'

'এ অধমের নাম বালা ভাট। লোকে বালাজী বলে ডাকে।'

'মহাশয়ের বাবার নাম?'

বিশ্বনাথ ভাট। তিনি স্বর্গত। ব্রাহ্মণ হিসাবে বাবার বিস্তর সামাজিক খাতির ছিল। আমি তাঁর অধম সন্তান। —আমার কোনও খাতির নেই।

'হুম্। আপনি ব্রাহ্মণ হলেও বেশ বিনয়ী। তবে আপনার বিনয়ের ভেতর কিঞ্চৎ খোঁচা আছে। কথায় কথায় নিজেকে অধম, নোকর ইত্যাদি বলেন। আমি বাপু সাদা সিধে লোক। ব্রাহ্মণকে খাতির করে চলাই আমার মূলধর্ম।'

'মহারাজা হলেন আমাদের মুলুকের মাথা। তাঁকে সমীহ করে কথা বলা ব্রাহ্মণদেরও কর্তব্য। আমি রাজাকে রাজোচিত সম্ভাষণ করেছি মাত্র। — তা আপনি যদি এ সম্ভাষণে অস্বস্তি বোধ করেন, পরে আর এ সম্ভাষণে আমি

যাব না।'

'সেই ভাল । হাসলেন শাহুজী। এরপর একটু থেমে বালভাটের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মহাশয়ের হাতে হিসাবের নথি-পত্তর দেখছি। মহাশয় এখানে কী কাজ করেন?

'আমি এখানে যে পেশায় নিযুক্ত, তা হল কায়স্থের পেশা। সেনাপতি ধনাজির সেরেস্তায় আমি রাজস্বের হিসাব রাখি। আমি 'কারকুন।'

'বটে?' শাহুজী কিঞ্চিৎ কৌতূহলী হলেন, 'এ কাজ কতটা জরুরি?'

'সৈন্যবাহিনী, কোতোয়ালি, রাজধানী, পথ-ঘাট সবই অবান্তর হয়ে যায়, যদি রাজস্বের ঘাটতি থাকে। চর্বি না মেশালে মশাল জ্বলে না। রসদ না থাকলে দুর্গের পতন ঘটে। রাজস্ব না থাকলে চৌপাট হয় রাজত্বের। রাজস্ব না পাওয়া গেলে মুঘল সাম্রাজ্যের মতো অত বড় সাম্রাজ্যও একদিন টিকবে না। তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়বে।'

বালভাটের কথা শুনে শাহুজী চমৎকৃত হলেন। তবে রাজস্ব আদায়ের বিষয়টি ছাড়া আর কোনও বিষয়ে তাঁর দখল আছে কি না, বোঝবার জন্য জিজ্ঞাসা করলেন, 'তা ভট্টমশায়ের যুদ্ধবিদ্যা ইত্যাদিও জানা আছে না কি?'

বালভাট হাসলেন, 'একজন সেনাপতির কাছে আমি যখন চাকরি করছি তখন এ বিদ্যাও আমি অধিগত করেছি। আমি যে কোনও সৈনিকের থেকে দ্রুত অশ্বচালনায় সক্ষম। তীরন্দাজিতে আমি দক্ষ। বর্শা ছুড়ে আমি বহু বন্যপ্রাণী বধ করেছি। পোশাকের ভেতরেই আত্মরক্ষার্থে আমি সর্বদা তরবারি রাখি। মহারাজের যদি হুকুম হয়, সেই গোপন তরবারি বের করে আমি এখনই যে কোনও মানুষের সঙ্গে অসিযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে পারি।'

'বটে? আপনি দেখছি অনেক গুণে গুণী।' লোকটির ভেতর অপ্রত্যাশিত বহু গুণের সমাবেশ দেখে শাহুজী আরও চমৎকৃত হলেন। বললেন, 'সেনাপরিচালনার ব্যাপারে আপনার কি কোনও অভিজ্ঞতা আছে?'

দীর্ঘনাসা ভট্টজীর চোখদুটি হঠাৎ যেন দপ্ করে জ্বলে উঠল। ঠোঁট দুটি ঈষৎ বিস্ফারিত হল। অর্থাৎ বালভাট হাসলেন। ঈষৎ হেসে বললেন, 'মহারাজ সেনাপরিচালনার কথা বললেন, কিন্তু কোথায় এ সেনা পরিচালনা করতে হবে, তার কথা অনুল্লিখিত রইল কেন? অরণ্যের লড়াই আর গিরিসঙ্কটের যুদ্ধ নিশ্চয় একরকম হবে না। শত্রুপক্ষকে বিব্রত ও অতিষ্ঠ করতে যে লুকনো লড়াই আমরা করি, তার কৌশলের সঙ্গে খোলা মাঠের লড়াই নিশ্চয় পৃথক হবে। কোথাও লড়বে পদাতিক বাহিনী, কোথাও অশ্বারোহী সৈন্য। কোনও কোনও স্থানে অসিচালনা খুবই জরুরি, কোনও কোনও স্থানে লড়াই করতে হয় বন্দুক-কামান নিয়ে। স্রেফ বাঘনখ দিয়ে আফজল খাঁকে ঘায়েল করেছিলেন ছত্রপতি শিবাজী। অন্য কোনও অস্ত্রের প্রয়োজনও হয়নি।'

'তা ঠিক। তা ঠিক।' শাহুজী রীতিমতো অভিভূত হয়ে পড়লেন। পরে ঈষৎ গম্ভীর হয়ে বললেন, 'মারাঠাদের আজ বড় দুর্দিন। এই মুহূর্তে সমস্ত মারাঠাশক্তি দ্বিধাবিভক্ত। আমি দীর্ঘদিন মুঘলদের হাতে বন্দি ছিলাম। আমার অনুপস্থিতিতে আমার কাকা রাজারাম সিংহাসনে বসে মারাঠাদের স্বাধীনতা বজায় রেখেছিলেন। বাদশা ঔরঙ্গজেবের আঘাতে জর্জর হলেও, তিনি ভেঙে পড়েননি। আজ রাজারাম মৃত। তাঁর মৃত্যুর পরে কাকিমা তারাবাঈ আমার খুড়তুতো ভাইকে 'দ্বিতীয় শিবাজী' বানিয়ে সিংহাসনে বসালেন। লড়াই চালাতে লাগলেন। গত সাত বছর ধরে এমনিই চলছিল। মারাঠাদের সব ক্ষমতা হাতের মুঠোয় নিয়ে তিনি রাজ্য চালাচ্ছিলেন। আজ আমি ফিরে এসেছি। আমিই হলাম সিংহাসনের হকদার। অথচ আমাকেই কিনা রানি তারাবাঈ অস্বীকার করছেন।'

'এ রকমই হয় মহারাজ। ক্ষমতা বড় ভয়ঙ্কর জিনিস। যে-বাঘ একবার রক্তের স্বাদ পেয়েছে, সে রক্ত খেয়েই বেঁচে থাকতে চায়। যে মানুষ একবার তখ্‌তে বসেছে, তাকে কি টেনে নামানো যায়? আমি এই মারাঠা জাতিকে ভালভাবে চিনি। আমি রানি তারাবাঈ, আর তাঁর মদতদাতাদেরও মনোভাব বুঝি। মারাঠারা একজন 'পুরুষ' দেশ-পালক চায়। মেয়েদের হাত ধরে যে পুরুষ চলে, তাকে মারাঠারা কোনওদিনই বরণ করে নেবে না। তা তিনি সাবালক বা নাবালক, যাই হোন না কেন?'

এক নিঃশ্বাসে কথাগুলি বলে গেলেন বালভাট। লোকটি নির্বিকার। অনুত্তেজিত। বরফের মতো শীতল। 'আপনিও সিংহাসন ফিরে পাবেন, তবে আগে প্রমাণ করতে হবে যে আপনি একজন খাঁটি পুরুষ। পুরুষবেশী নারী নন। দীর্ঘদিন আপনি মুঘলদের কাছে বন্দি ছিলেন। আপনি হারিয়ে গিয়েছিলেন একেবারে শিশু অবস্থায়। আর ফিরে এলেন যৌবনে। ওই ক'বছর ধরে মারাঠারা আপনাকে কেউ দেখেনি। তারা জানে না, আপনি কেমনভাবে তৈরি হয়েছেন।'

শাহুজী এ কথার কোনও উত্তর দিলেন না। তিনি অনুভব করলেন, দীর্ঘদিন মুঘল অবরোধে থাকার জন্য তিনি দেশ ও সময়ের থেকে অনেকখানি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন। ভট্ট বালাজী যে কথাগুলি তাঁকে অসঙ্কোচে বলে গেলেন, একথাগুলির জবাব তাঁর ঝুলিতে নেই। তাঁর ধারণা ছিল, জন্মসূত্রেই তিনি এ দেশের রাজা। মারাঠাদের হৃদয়ে তাঁর সিংহাসন পাতা। তা তিনি যেখানেই থাকুন না কেন। মুঘলদের বন্দিশালায় বসে বছরের পর বছর ধরে তিনি এই ধারণাই লালন করে গেছেন।

ভট্ট বালাজী তাঁর বরফশীতল গলায় ধাতব স্বরে বললেন, 'আমার কথাগুলি কি মহারাজকে আঘাত করেছে? আপনি আমার কথায় দুঃখ পেয়েছেন। যদি দুঃখ পেয়ে থাকেন, তার জন্য এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ খুব দুঃখিত।

মহারাজ, আপনি মারাঠা দেশকে যেমন ভালবাসেন, এই ব্রাহ্মণও ঠিক ততখানিই এ দেশকে ভালবাসে। যদি কোনও অনভিপ্রেত বাঁকা কথা হুজুরকে বলে থাকি, তা অভিমানভরেই বলেছি। মহারাজকে উদ্দীপিত করার জন্যই বলেছি। আর এই ব্রাহ্মণের বুদ্ধিকে যদি আপনি তারিফ করে থাকেন, তা হলে তাকে তলব করতে দ্বিধা করবেন না।'

শাহুজী বললেন, 'এখনই আপনাকে আমি কাজে লাগাতে চাই।'

'না মহারাজ। এখনই না। উত্তেজনার বশে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তের আমি বিরোধী।' ভট্ট বালাজীর গলায় সেই বরফশীতল ধাতব স্বর, 'আপনি অন্তত মাস তিনেকের মতো সময় ধরে বিবেচনা করুন, সত্যিই আপনার কোনও কাজে আমার প্রয়োজন আছে কি না? আর আমি আপনাকে কী ভাবে সেবা করব, সেটা একটু মন দিয়ে ভাববেন।

সেনাপতি ধনাজী যাদব এতক্ষণ ধরে চুপচাপ বসেছিলেন। তিনি শাহুজীকে বললেন, 'মহারাজ! আপনি সবে এই মারাঠা ভূমিতে পা রেখেছেন। আপনার সামনে এখন হাজার কাজ পড়ে রয়েছে। বহু লোক আপনার বিরোধিতা করতে এগিয়ে আসবে। আবার বহু লোক আপনার দিকে বাড়িয়ে দেবে সাহায্যের হাত। তাই কাকে কী ভাবে কাজে লাগাবেন, তা এখনই বলা সম্ভব নয়। সেই হিসাবে ভট্টের প্রস্তাব কিছু খারাপ নয়। আগে আমরা কাজে নামি, তারপর কাজের কথা ভাবব। ভট্ট বালাজীর থেকেও যোগ্য লোক আমরা পেতে পারি।'

'তা অবশ্য ঠিক।'

'মহারাজের অনুগত আরও অনেক সেনাপতি আছেন, তাঁদের সঙ্গে আপনাকে শলাপরামর্শ করতে হবে, নয় কি?'

'হ্যাঁ, তা করতে হবে।'

'তা ছাড়া ভট্ট বালাজীও ভেবে দেখুন তিনি আমাদের ভাগ্যের সঙ্গে নিজেকে জড়াতে চান কি না? মারাঠাদের ভেতর সিংহাসন নিয়ে যেভাবে গোলমাল পাকিয়ে উঠেছে, তাতে আমাদের জয় নিশ্চিত হবে কি না, তা এখনই বলা যায় না। যদি কোনওরকমে আমাদের পরাজয় হয়, তা হলে সবংশে আমাদের চৌপাট হয়ে যেতে হবে। কেউ আমাদের তখন বাঁচাতে পারবে না। ভট্ট বালাজীও ভেবে দেখুন সে রকম কোনও ঝুঁকি নিতে রাজি আছেন কি— না। তাছাড়া, বালাজী এখন আমার কর্মচারী। আরেকটা উপযুক্ত কর্মচারী না পাওয়া পর্যন্ত, তাঁকে আমি ছাড়ি কেমন করে? তার জন্যও আমার একটু সময় লাগবে হুজুর!'

'তা ঠিক। তাহলে বালাজী, ওই কথাই রইল।'

বালাজী হাসলেন, বরফের মতো শীতল হাসি। বিকারহীন ধাতব স্বরে বললেন, 'মহারাজের জয় হোক।'

আরম্ভটা এইভাবেই হয়েছিল। অপরিণত মনের এক রাজার সঙ্গে ক্ষুরধার বুদ্ধিসম্পন্ন এক ব্রাহ্মণের যোগাযোগের সূচনা সেই প্রথম। প্রথম সাক্ষাতের পরে দু'জনে ছিটকে গেলেন দু'দিকে। অথচ দু'জনের মনের ভেতরেই দু'জনের জন্য জেগে রইল প্রত্যাশা।

ভারি মজার মুলুক এই মহারাষ্ট্র। মারাঠাবাড়া দেশটা জুড়ে পাহাড় আর পাহাড়। মাটি ভারি উর্বর। সহ্যাদ্রি আর পশ্চিমঘাট পর্বতমালা এই মুলুকের পশ্চিমদিকের পাহারাদার। উত্তরে সাতপুরা, আর বিন্ধ্য পর্বত খাড়া দাঁড়িয়ে উত্তরের দেশগুলি থেকে এমুলুককে আড়াল করে রেখেছে। নর্মদা আর তাপ্তী এই মুলুককে ঘিরে অছে পরিখার মতো। বহিরাগত সেনানায়করা দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে এসে এদেশে ঢোকবার মুখে হঠাৎ থমকে দাঁড়ায়। এ মুলুকের পথঘাট বড় গোলমেলে। অধিত্যকায়-উপত্যকায় বড় জঙ্গল। পাহাড়ি মাওয়ালি যুবকরা তীরন্দাজিতে বড় নিষ্ঠুর। রাজা-উজির খাতির করে না। এরা শেয়ালের মতো ধূর্ত। নেকড়ের থেকেও হিংস্র ও কৌশলী। অরাতিকুল প্রবল বুঝতে পারলে এরা পাহাড়ি মূষিকের মতো নিমেষে ঢুকে যায় পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে।

এদের নিয়ে প্রথম একটি রাজ্য তৈরি করার স্বপ্ন দেখলেন শিবাজী। বয়স তখন তাঁর ষোলো-আঠারোর বেশি নয়, শিবাজীর বাবা শাহজী একজন দক্ষ কর্মচারী ছিলেন বটে, কিন্তু রাজা হওয়ার স্বপ্ন তিনি কখনও দেখেননি। প্রথমা পত্নী জিজাবাঈ এবং দ্বিতীয়া পত্নী তুকাবাঈকে নিয়ে তিনি সুখেই ছিলেন। গোল বাধল শিবাজীর জন্মের পর থেকে। নিজের ভেতর যে শিশোদীয় বংশের রক্ত রয়েছে তা টের পাওয়া গেল। শিশোদিয়ারা বরাবরই দাপুটে। বড় উচ্চাকাঙ্ক্ষী। শিবাজীর ভেতর রক্তের ওই লক্ষণগুলি প্রকট হতে দেখা গেল। এদিকে জিজাবাঈয়ের রক্তে ছিল দেবগিরির যাদব বংশের পরাক্রম। সংগ্রাম করার প্রবণতা। ষোলো বছরের ছেলে শিবাজী তোরনা দুর্গ দখল করে হঠাৎ সকলকে চমকে দিলেন।

তোরনা দুর্গ দখল করে যে-অভিযানের সূচনা হয়েছিল সে অভিযান দিকে দিকে ব্যাপ্ত হল। বিদ্রোহী বীরের কাছে একে একে অবনত হল— সিংহগড় ও গড় পুরন্দর। পাহাড়ের মাথায় তিনি নিজেই বসিয়ে নিলেন রাজগড়, প্রতাপগড় এবং রায়গড়ের মতো দুর্গ। রায়গড়ে একদিন 'রাজা' হিসেবে অভিষেক হল তাঁর। প্রতাপগড়ে তিনি মুখোমুখি হলেন আফজল খাঁয়ের সঙ্গে। কেবল মুখোমুখি নয়, কোলাকুলি। দশাসই চেহারার আফজল চেয়েছিলেন কোলাকুলির সময় পাহাড়ি-ইঁদুরটাকে টিপে পিষে মেরে ফেলতে। সফল হলেন না তিনি। বরং ব্যাপারটি বিলকুল উল্টো হয়ে গেল। শিবাজীর কামিজের নীচে ছিল লোহার বর্ম। আর হাতের আঙুলের ফাঁকে পরা ছিল লোহার বাঘনখ। শিবাজীর হাতের বাঘনখ আফজালের বুক ছিঁড়ে

ফেলল। 'হা-আল্লাহ', বলে আফজল মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। এই সব ঘটনার পর শিবাজী নজরে পড়লেন হিন্দুস্তানের বাদশার।

শায়েস্তা খাঁ এলেন পাহাড়ি-ইঁদুরকে শায়েস্তা করতে। শাহী ছাউনি পড়ল পুনায়। পাহাড়ি রাজ্যে ঢোকবার আগে পুনায় বসে খাঁ সাহেব আঁক কষতে থাকলেন। আঁটতে থাকলেন ফন্দি-ফিকির। কিন্তু চতুরঙ্গের ছক পাতবার আগেই কিস্তি মাৎ করে বেরিয়ে গেলেন শিবাজী। রাতের আঁধারে হানাদারেরা এসে খাঁ সাহেবের সব পরিকল্পনা ফাঁসিয়ে দিয়ে গেল। শিবাজীর তরবারির এক কোপে তাঁর বুড়ো আঙুলটি কাটা পড়ল। খাঁ সাহেবের ছেলে ফতে মিঞা হানাদারদের রুখতে গিয়ে নিহত হল। মারা পড়ল আরও সেনা সেপাই। দিল্লির মুঘল মহিমা পুনার মাটিতে ধূলি-মলিন হল।

রাগে ফেটে পড়লেন বাদশা ঔরংজেব। শাহী তখ্‌তে বসে তিনি হুঙ্কার ছাড়লেন, 'এই মুঘল শিবিরে কি এমন কোনও লোক নেই, যে বে-আদব পাহাড়ি ইঁদুরটাকে জাঁতিকলে বন্দি করে আমার দরবারে ধরে নিয়ে আসে?'

দরবার নিস্তব্ধ। সেনাপতি দিলির খাঁ নির্বাক। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন তিনি বাদশার মুখের দিকে। রাজপুত সেনানায়করা বাদশার কথা না-শোনার ভান করে ময়ূর-সিংহাসনের ময়ূরপুচ্ছ দেখতে থাকলেন।

বাদশার কণ্ঠে আবার গর্জন শোনা গেল। দরবারি রাজপুতদের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'রাজা মানসিংহের মতো সেনাপতি আমার নেই, তা আমি জানি। কিন্তু রাজপুতরা কি এমনই হীনবলে হয়ে পড়েছে, যে একটি পাহাড়ি ইঁদুরকে ধরে এনে এই দরবারে ফেলতে পারে না?'

'পারে হজরত। মুঘলদের সেবায় রাজপুতেরা আজও জান কবুল করতে প্রস্তুত। কিন্তু হজরত, আপনি যাকে পাহাড়ি-ইঁদুর বলছেন, সে পাহাড়ি ইঁদুর নয়।'বনের বাঘ কথাগুলি এক নিঃশ্বাসে বলে গেলেন অম্বররাজ জয়সিংহ।

'অম্বররাজ জয়সিংহ সুস্থ আছেন বলেই জানতাম। এখন দেখছি তিনি মানসিক দিক থেকে অসুস্থ।' বাদশা শ্লেষোক্তি করলেন।

জয়সিংহ হাসলেন। বাদশার শ্লেষোক্তি তিনি হেসেই উড়িয়ে দিলেন। বললেন, 'হজরত হলেন দুনিয়ার মালিক। তাঁর হুকুম এড়িয়ে যেতে পারে, এমন আহাম্মক হিন্দুস্তানে আজও কেউ নেই। তাঁর হুকুমে ফকির রাজা হয়। আবার রাজা ফকির হয়ে যায়। আমার এমন তরতাজা মাথাটা হজরতের হুকুমে এখনই ঘাড় থেকে ছুটে যেতে পারে। হুজুরের হুকুম এমনই তেজী। এমনই বলবান। তবে তাঁর ইচ্ছা বা তাঁর হুকুমে দুনিয়ার সব কিছুর ওলট-পালট হয় না। হুকুম দিয়ে তিনি ইঁদুরকে সিংহ বানাতে পারেন না। তেমনি তাঁর ইচ্ছায় সিংহও হতে পারে না ইঁদুর। হজরত যে খোদা নন, সেটা [illegible] পারলে আমার দিল হালকা হতে পারে। তা সেইটুকু দেখাবার জন্যে [illegible] শিবাজীর সঙ্গে লড়াইয়ে যেতে আমি রাজি আছি। আমি তাঁকে

বুঝিয়ে সুঝিয়ে এখানে আনতেও চেষ্টা করব। একেবারে হুজুরের দরবারে।'

'সাবাস্।'

'এখনই বাহবা দেবেন না হুজুর। কেন না নিজের সফলতা সম্পর্কে এখনও আমি নিশ্চিত নই। তা ছাড়া আমার দুটি শর্তও আছে।'

বাদশা ঔরংজেব হাসলেন, 'কী সে শর্ত?'

'শিবাজীর বিরুদ্ধে আমি যে যুদ্ধযাত্রা করব, এ যাত্রায় আমার সাথী হতে হবে সেনাপতি দিলির খাঁকে। এটা হল আমার প্রথম শর্ত।— দ্বিতীয় শর্ত হল, আমি যদি কোনও রকমে শের শিবাজীকে দিল্লির এই দরবারে বুঝিয়ে সুঝিয়ে আনতে পারি, তা হলে বাদশা তাঁকে কোনওরকমেই যেন বন্দি না করেন।'

'উত্তম প্রস্তাব। অম্বররাজ জয়সিংহের দুটি শর্তই মঞ্জুর করা হল।'

দক্ষিণ দেশের নগরে নগরে এবার বেজে উঠল রণ দামামা রণশিঙ্গা। চারলাখ অশ্বারোহী সৈন্য। হাজার কয়েক হাতি। এছাড়া পদাতিক সৈন্য, উট এবং মেলা রসদবাহী লোক নিয়ে অম্বররাজ জয়সিংহ এবং মুঘল সেনাপতি দিলির খাঁ চললেন শের শিবাজী পাকড়াও করতে।

যদিচ এ ঘটনা ঘটেছিল শাহুজীর জন্মের বছর সতেরো কিংবা তারও আগে, কিন্তু চোখ বুজলে শাহুজী মুঘলবাহিনীর এই আক্রমণের ছবি আজও দেখতে পান। ঠাকুমা রানি তুকাবাঈ তাঁর শৈশবে শাহুকে এ ঘটনার কথা বহুবার বলেছেন। বিশাল এক সৈন্যবাহিনীর হাজিরার জন্য দক্ষিণের জনপদগুলির নাভিশ্বাস উঠল। বহু শস্যক্ষেত্র বিনষ্ট হন। বিধ্বস্ত হল লোকালয়গুলি। দোকান-পাট লুঠ হল। গৃহস্থের তরুণীবধূরা বিপন্ন হলেন। রাস্তাঘাটে চোর ছ্যাঁচোড়ের দাপট বাড়ল। মাগ্‌গী হল খাবারের জিনিস। চারদিকে রটে গেল, পাহাড়ি ইঁদুর এবার জাঁতিকলে পড়বে। তার লুকোবার আর জায়গা নেই।

শিবাজী নিজেও বিপন্ন বোধ করতে থাকলেন। তাঁর হাজার হাজার মাওয়ালি সেনা জন্মভূমি বাঁচাবার জন্য প্রাণ দিল। তবু দেশ বাঁচে না। পরিস্থিতি বুঝে শিবাজী আর শক্তিক্ষয় না করে পাঠিয়ে দিলেন সন্ধির প্রস্তাব।

রাজা জয়সিংহের কাছে গেল সন্ধির প্রস্তাব। দূতের মুখ থেকে এ প্রস্তাব পেয়ে প্রথমে বিশ্বাস করতে চাইলেন না রাজা।

'বলো কী দূত, শিবাজী নিজে এ প্রস্তাব পাঠিয়েছেন? নিজে?'

'জি।'

'তাঁর পঁয়ত্রিশটি দুর্গের ভেতর ১২টা রেখে বাকি ২৩টির চাবিকাঠি আমাদের দিয়ে দেবেন?'

'জি।'

'চল্লিশ লাখ টাকার বার্ষিক রাজস্ব এখন থেকে আমরা পাব! শিবাজী তাঁর

কণামাত্র নেবেন না।'

'না।'

'শের শিবাজী এখন থেকে তা হলে কী করবেন?'

'আজ্ঞে, আপনাদের যেমন হুকুম হবে, উনি সেইমতো কাজ করবেন।'

'আশ্চর্য।' রাজা জয়সিংহ নিজের মনে বিড়বিড় করে ওই 'আশ্চর্য' কথাটিই অন্তত পাঁচবার বললেন, 'আমি শিবাজীর সঙ্গে নিজে মুখোমুখি একবার দেখা করতে চাই।'

'হুজুরের ইচ্ছা পূর্ণ হবে।'

শিবাজীর রাজধানী রায়গড় তখন অবরুদ্ধ। রাজপুত সেনা আর মুঘল সেপাইরা ঘিরে বসে আছে রায়গড়। বর্ষাকাল আসন্ন। হঠাৎ হঠাৎ দু'একপশলা বৃষ্টি হয়ে যায়। পথঘাট পিচ্ছিল হয়ে পড়ে। পাহাড়ি খাড়াই পথে অশ্বারোহী সৈনিকদের ওপরে ওঠা কঠিন হয়ে ওঠে।

'রায়গড়' দুর্গের নিভৃতকক্ষে রাজা জয়সিংহের সঙ্গে মুখোমুখি আলোচনায় বসলেন শিবাজী। শিবাজীর দিকে বারবার তাকিয়ে দেখেন জয়সিংহ এবং বারবার তাঁর চোখে বিস্ময় নামে। ইনিই সেই দুর্ধর্ষ শিবাজী? ইনিই আফজলের বুক ছিঁড়ে দিয়েছিলেন? ইনিই সেই মানুষ যিনি শায়েস্তা খাঁর আঙুল কেটে নিয়েছিলেন?

'আপনি শিবাজী, সার্বভৌম রাজা হিসাবে টিকে থাকতে চান না?'

'চাই। কিন্তু পরিস্থিতি প্রতিকূল। 'হিন্দুস্তানের বুকে এখন স্বাধীনভবে টিকে থাকা সম্ভব নয়।'

'বেশ, তাই হবে।—হাসলেন অম্বররাজ জয়সিংহ, 'যদি শের শিবাজীকে দিল্লি যেতে হয়, তিনি দিল্লি যাবেন?'

'যাব।' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে শিবাজী বললেন, 'তবে দেখবেন আমার সম্মান যেন ঠিকমতো বজায় থাকে।'

'থাকবে।' হাসলেন জয়সিংহ, 'তবে প্রথমে আপনি যদি না যেতে চান, শম্ভুজী চলুন। তাঁর খাতির দেখে পরে আপনি আসবেন?'

এরপরের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত। শম্ভুজী তখন মাত্র আটবছরের ছেলে। শিবাজীর খাতিরে তাঁর আট বছরের ছেলেকে শাহী বদান্যতার প্রতীক হিসাবে পাঁচহাজারী মনসবদার করা হল। সন্ধি যে কতখানি আন্তরিক, তা দেখানোর জন্য অম্বরাধিপতি রাজা জয়সিংহ শিশু শম্ভুকে সঙ্গে করে নিয়ে চললেন দিল্লি। সঙ্গে চলল বিস্তর উপঢৌকন। চলল কয়েক জন মারাঠা দেহরক্ষী।

যাত্রার আগের মুহূর্তে শিবাজীর আবার মতি পরিবর্তন হল। একা একা বাচ্চাটাকে পাঠিয়ে দেবেন শত্রুপুরীতে?

শিবাজী বললেন, 'কেবল শম্ভু নয়, আমি নিজেও দিল্লি যেতে চাই।'

'শের শিবাজী আমার সঙ্গে দিল্লি যাবেন, এমন আনন্দের খবর আর কী

থাকতে পারে?'

'শিবাজী মহারাজ!'— আপনাকে একটি কথা সরাসরি আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই। এই জিজ্ঞাসার অকপট উত্তর আমি পাব?'

'পাবেন। আমি সাদাসিধে পাহাড়ি মানুষ।'

'আপনি দিল্লি যেতে চাইছেন কেন? আপনার নতুন কোনও কৌশল?'

শিবাজী হাসলেন, 'মুঘলদের হাতের মুঠোয় আমি যাচ্ছি। এর ভেতর আমার কী কৌশল থাকতে পারে?'

'কিন্তু আপনি যে এত সহজে ধরা দিচ্ছেন, তা যেন বিশ্বাস হয় না।' উত্তরে শিবাজী হাসলেন। তারপর তাঁর চোখ স্তিমিত হল, কী যেন তিনি ভাবতে শুরু করলেন।

শিবাজি দিল্লি গিয়েছিলেন। অসম্মানিত বোধ করে উত্তেজনা প্রকাশ করায় কারারুদ্ধ হন। কিন্তু বাদশাকে বোকা বানিয়ে ঝাঁকার ভেতর গা ঢাকা দিয়ে পালিয়ে এলেন রাজধানী থেকে। এরপর চোদ্দো বছর ধরে তিনি সিংহ পরাক্রমে দক্ষিণ দেশ দাবিয়ে রাখলেন।

প্রতাপগড় ছিল শিবাজীর প্রিয় দুর্গ। এখানে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ভবানী মূর্তি। ভবানীমায়ের আশীর্বাদপূত তরবারি হাতে নিয়ে যখন তিনি লড়াই করতে নামতেন, তখন তিনি ছিলেন অজেয়।—সহ্যাদ্রি পাহাড়ের ওপর ছিল এই গড়। চার হাজার ফুট উঁচুতে।—এই উঁচু পাহাড় থেকে ঝড়ের বেগে তিনি নেমে আসতেন ঘোড়া ছুটিয়ে! এখান থেকে সোজা চলে যেতেন ঠানা, কোলবা জেলার নানান দুর্গম জায়গায়। হানা দিতেন শত্রু শিবিরে। এভাবে বহুদিন কেটে গেছে।

এই দুর্গেই একদিন ঘুমের মধ্যে বিশ্রী একটা স্বপ্ন দেখলেন তিনি। কে যেন তাঁকে বলছে, 'তোমার বংশে পাপ ঢুকেছে, টের পাওনি?'

পালঙ্কের ওপর অনেকক্ষণ থম্ মেরে বসে রইলেন শিবাজী। রাত ফুরিয়ে আসছে। পৃথিবীর বুকে একটু একটু করে ফুটে উঠছে আলো। পুবের আকাশ রাঙা হয়ে উঠছে। কক্ষের ভেতর ম্লান হয়ে আসছে চেরাগের শিখা। মহারাষ্ট্র কেশরী শিবাজী কেমন যেন বিমূঢ় হয়ে পড়লেন।

রাজকুমার শম্ভুকে জড়িয়ে ইতিপূর্বে কিছু কিছু কথা তাঁর কানে এসেছে। কিছু কিছু অভিযোগ। কিন্তু ওসব উড়ো অভিযোগ তিনি তেমনভাবে তলিয়ে দেখেননি। আজ মতি বদলালেন। দিকে দিকে চর পাঠালেন। রাজপুত্র শম্ভুর চরিত্রের বিষয়ে সঠিক খবর চাই। সে কি নাচের মজলিশ বসায়। সে শরাব পানে আসক্ত?

দু'চার দিনের মাথাতেই খবর এল। মহারাজের অনুমান সত্যি। শম্ভুজী সবরকম অনৈতিক কাজের সঙ্গেই যুক্ত। শের শিবাজী যে মঙ্গলদ্বীপ জ্বালিয়ে রেখেছেন, সেই মঙ্গলদীপের তলাতেই গাঢ় অন্ধকার।

পুত্র শম্ভুর চরিত্রহানির খবর পাওয়ার পর থেকেই তাঁর ভেতর ঘুণপোকার খেলা শুরু হয়ে গেল। বড় বড় কাঠের কাঠামোকে নিঃশব্দে এবং সকলের অগোচরে ফোঁপরা করে দিতে পারে এই ঘুণপোকা। প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠেই শিবাজী অনুভব করেন তাঁর ভেতর ফাঁকা হয়ে যাওয়া। তবে বাইরের দিক থেকে তাঁকে দেখে কিছুই টের পাওয়া গেল না।

সেবার বর্ষাটা জমল না। আকাশ জুড়ে বিস্তর মেঘ দেখা গেল, কিন্তু তেমন বর্ষা হল না। ভাদ্রের মাঝামাঝি মেঘরাশি ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে, শেষে প্রায় ফুরিয়েই গেল। সাতপুরা পাহাড়ের ওপর দিয়ে জলহীন মেঘমালা একে একে ভাসতে ভাসতে চলে গেল উত্তরের দেশে। সহ্যাদ্রির মাথা বেবাক হাল্কা হয়ে গেল। সন্ধ্যা হতে-না-হতে সহ্যাদ্রির মাথায় দেখা দিতে থাকল উজ্জ্বল হীরকপুঞ্জের মতো ঝলমলে নক্ষত্রমালা। এক নির্জন পাহাড়ি দুর্গে বসে শিবাজী খবর পেলেন যে মুঘল সেনাপতি দিলির খাঁ ভীমা নদী অতিক্রম করে বিশাল এক ফৌজ নিয়ে সকলের অগোচরে এগিয়ে আসছেন। ইতিমধ্যে শিবাজীর বিখ্যাত দুর্গ ভূপালগড়ের পতন হয়েছে। ভূপালগড় ছিল শিবাজীর বিশেষ পছন্দের দুর্গ। আত্মীয়বর্গের গোপন আস্তানা ছিল এই সুরক্ষিত গড়। সকলের অগোচরে বিস্তর টাকা-পয়সা এবং রাশি রাশি সোনা এখানে পাহাড়ের গহ্বরে রেখে দিয়েছিলেন শিবাজী। দুর্দিনের সঞ্চয়। দুর্ভেদ্য এই দুর্গের পতনের পর শিবাজী মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। ঘরে বাইরে এ কী অশুভ শুরু হল।

ডাক পড়ল রাজ জ্যোতিষীর। পাঁজি পুঁথি ঘেঁটে জ্যোতিষী বললেন, 'মারাঠাদের পক্ষে সময়টা ভাল নয় মহারাজ। সহ্যাদ্রির মাথায় যে-ভাবে লুব্ধকনক্ষত্র জ্বল জ্বল করে জ্বলছে, তাতে এ মুলুকের সমূহ ক্ষতি আসন্ন। শস্যহানি। দুর্ভিক্ষ। যবনদের দ্বারা আক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। তবে, মহারাজের কোষ্ঠীতে গ্রহ সংস্থান এতই প্রবল যে, মহারাজকে ডিঙিয়ে কারো কিছু করবার ক্ষমতা নেই।'

রাজ-জ্যোতিষীর কথায় শিবাজীর মন ভিজল না। বরং তাঁর কথাগুলিকে তোষামোদ বলেই মনে হল তাঁর।

তবে রণ-কুশলী শিবাজী হাত গুটিয়ে বসে থাকবার পাত্র নন। দিলির খাঁর অভিযানের উপযুক্ত জবাব দেবার জন্য তিনি পাল্টা আক্রমণের ব্যবস্থা নিলেন। দিলির খাঁয়ের মুখোমুখি না হয়ে তিনি আঠারো হাজার অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন দক্ষিণের শহর জালনায়। জালনা শহরটি ছোট, কিন্তু সমৃদ্ধ। ব্যবসা -কেন্দ্র হিসাবে এ শহরে কোটি কোটি টাকার লেনদেন হয়। শহরটি জনবহুল। ঔরঙ্গাবাদ থেকে বিশক্রোশ পশ্চিমে। ভূপালগড় দুর্গের পরাজয়ের গ্লানি ভোলবার জন্য শিবাজী এখানে দেখা দিলেন নির্মম লুঠেরার ভূমিকায়।

শহরটি সহজেই অধিকারে এল। অধিকারের পর চলল অবাধ লুণ্ঠন। লুণ্ঠনের শেষে যখন সম্পদের হিসেব করতে বসা হল, তখন অবাক

বিস্ময়ে দেখা গেল, যা আন্দাজ করা গিয়েছিল, তার সিকিও মেলেনি। সব সম্পদ যেন কর্পূরের মতো উবে গেছে।

'কেন এমন হল?' সেনাপতি আনন্দ রাওয়ের দিকে জিজ্ঞাসাটা ছুড়ে দিলেন শিবাজী। তাঁর চোখ তখন ঘোর রক্তবর্ণ। 'এই জালনা শহরে কোটি কোটি টাকার লেনদেন হয়। ঘরে ঘরে রাশি রাশি স্বর্ণমুদ্রা। বণিক পল্লীতে দামি দামি জিনিস ঠাসা। সে সব জিনিস কোথায় গেল? আমরা যে-পরিমাণ সম্পদের আন্দাজ করে শহরে-নগরে ঢুকি, তা কখনও ব্যর্থ হয় না। আজ সব ওলটপালট হয়ে গেল কী করে?'

সেনাপতি আনন্দ রাও মাথা নিচু করে বললেন, 'মহারাজ যা অনুমান করেছেন, তা সত্য। এ শহরের সব সম্পদ আমরা লুঠ করতে পারিনি। এক ফকির সাধু আমাদের বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছেন।'

'ফকির? সাধু? কে সে সাধু, সেই সাধুর নাম কী?'

'আজ্ঞে, তাঁর নাম, সৈয়দ জান মহম্মদ। এই শহরের থেকে একটু বাইরে তাঁর মাজার। আশ্রম। শহরের বেনিয়ারা মহারাজের আক্রমণের খবর পেয়ে সেখানে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। এরা সকলেই ইমানদার ধনী। নিজেদের যাবতীয় ধনরত্ন, সোনা-রুপো পেটিকায় ভরে গো-শকটে করে সৈয়দ সাহেবের আস্তানায় নিয়ে গেছে। তেনারা সবাই এখানেই আছেন। ফকির ভরসা দিয়েছেন তাঁদের সম্পদ রক্ষার।'

'বটে?' শিবাজী একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, 'আমাদের ফৌজ এ খবর জানে?'

'জানে মহারাজ।'

'তা তারা তাদের কাজ করেনি কেন?'

'আপনার নিষেধ আছে বলে ফকিরের আশ্রমে আমরা ঢুকিনি। আপনার হুকুম আমরা ভুলে যাইনি মহারাজ। আপনার হুকুম আছে কোনও দেবস্থান যেন আমরা লুঠ না করি। তা সে হিন্দুর মন্দির, মুসলমানের মসজিদ কিংবা কেরেস্তানদের গিরজা, যাই হোক না কেন। আপনার হুকুম আছে, কোনও ধর্মগ্রন্থ হাতে এলে, তা যেন সেই ধর্মের আচার্যের হাতে তুলে দেওয়া হয়। সুরাট লুঠের সময় আমরা কয়েকটি বাইবেল আর একটি কোরান কুড়িয়ে পেয়েছিলাম। আপনার হুকুম মোতাবেক সেগুলি আমরা ফিরিয়ে দিয়েছিলাম গিরজার এক পাদরি সাহেবকে, আর মসজিদের এক ইমামকে।'

'হ্যাঁ, মসজিদ-মাজারে ঢুকে, তাকে অপবিত্র করার আমি বিরোধী। কিন্তু যারা নিজেদের টাকা-পয়সা বাঁচাবার জন্য মাজারকে কলুষিত করে, তাদের ক্ষমা করা যায় না। নগরে আগুন লাগলে দেবালয় সে আগুন থেকে রেহাই পায়? তবে নগরে আগুন আমি লাগালেও, মাজার-মসজিদে আমি মশাল নিয়ে ঢুকিনি। তবে আজ ঢুকব। মাজার অপবিত্র করার জন্য নয়। অপবিত্র কয়েকটি জীবকে সেখান থেকে বের করবার জন্য।'

ঘোড়া ছুটল। নগরপ্রান্তে ফকিরের আশ্রম। সৈয়দ জান মহম্মদ কয়েক বছর ধরেই এই আশ্রমটি গড়ে তুলেছেন। ভারি নিরিবিলি জায়গা। এই নিভৃত জায়গাতেই তিনি সাধন ভজন করেন। হিন্দু সাধুদের যেমন চেলা থাকে, ফকির সাহেবেরও তেমনি গুটি কয়েক চেলা আছে। নগরের থেকে প্রয়োজনীয় জিনিস সওদা করে আনে। এদের মুখ দিয়েই ফকির সাহেবের অলৌকিক শক্তির কিছু কিছু খবর বাইরে ছড়ায়। মানুষ এসে অসুখ বিসুখের দাওয়াই চায়। সন্তান চায়। শেঠ রামদাস দীর্ঘদিন অপুত্রক ছিলেন, ফকিরের দোয়ায় তিনি একটি পুত্রসন্তান পেলেন। কোতোয়ালির রজব আলি হঠাৎ বুকের ব্যথায় বিছানা নিয়েছিলেন। দু'মাস ধরে চিকিৎসা চলল। হেকিমি-কবিরাজী কিছুই বাদ গেল না। নানা ধরনের বিদঘুটে পাঁচন আর হেকিমি সালসা খেয়ে বেচারির হিক্কা উঠে গেল। তা ঠিক সেই সময় হুজুর রজব আলির এক সেপাই নিয়ে এল ফকির সাহেবের দোয়া। এক পুরিয়া মাটি। নুড়ি দিয়ে খলে মেরে সেটি খাইয়ে দেওয়া হল আলি সাহেবকে। ব্যস, ঘণ্টা দেড়েকের ভেতর সব ব্যায়রাম বিলকুল হাওয়া। এই ধরনের দু-চারটে ঘটনা ঘটার পর থেকে ফকির জান মহম্মদের আশ্রম হয়ে গেল তীর্থক্ষেত্র।

হাজার চারেক অশ্বারোহী সেপাই নিয়ে শিবাজী স্বয়ং এসে চড়াও হলেন ফকির সাহেবের আশ্রমে। আশ্রমের ভেতরে তখন বিস্তর লোক। আগে থাকতেই তারা আতঙ্কে আধমরা। —এখন ওই কয়েক হাজার অশ্বারোহী সৈনিক দেখে তারা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদতে বসল।

ছত্রপতি শিবাজীকে দেখে ফকির সাহেব নিজেই বেরিয়ে এলেন আশ্রম থেকে। ছোট্ট একটি নমস্কার করে তিনি দাঁড়ালেন শিবাজীর সামনে।

'এ আমার কী বরাত। রাজাসাহেব স্বয়ং এসেছেন এই দীন ফকিরের আশ্রমে। আল্লার দোয়া না থাকলে এমন কখনও হয়?'

শিবাজী এই সম্বর্ধনায় অনুমাত্র বিগলিত হলেন না। সারাদিনের ঝামেলায় তিনি তখন রীতিমতো বিরক্ত। সুতরাং কোনওরকম ভূমিকা না করে, সোজাসুজি তিনি বললেন, 'আপনার আশ্রমে আমি অতিথি হতে আসিনি ফকির সাহেব। দোয়া চাইতেও আসিনি। এসেছি আমার হক পাওনা বুঝে নিতে।'

'হক পাওনা?'

'আপনি যাদের আশ্রয় দিয়েছেন, তাদের কাছে আমার পাওনা রক্ষিত আছে। দিয়ে দিলেই চলে যাই।'

নিরুপায় ফকির সাহেব শেষমেশ মিনতি করে বললেন, 'মহারাজ। আল্লাহের কাছে দোয়া জানাই, আপনি একশ বছর পরমায়ু লাভ করুন। ধনে পুত্রে আপনি ঐশ্বর্যশালী হন। দোহাই আপনাকে, আমার আশ্রিতদের আপনি এবারের মতন রেহাই দিন। দোহাই।'

শিবাজী একটুও নরম হলেন না। যেমন দৃঢ় ছিলেন, তেমনই দৃঢ় রইলেন। ঘোড়ার ওপর বসেই তিনি সেনাপতিকে আনন্দ রাওকে ইশারা জানালেন।

সঙ্গে সঙ্গে হাজার অশ্বারোহী ঝাঁপিয়ে পড়ল ফকির সাহেবের মাজারের ভেতর। আধ ঘণ্টার ভেতরই কাম ফতে হয়ে গেল।

শিবাজীর জীবনে এটাই ছিল শেষ অভিযান। শেষ লুণ্ঠন। তবে এটাই যে শেষ, তা তিনি নিজেও জানতেন না। কেননা, সৈনিক হিসেবে তখনও তিনি তরতাজা। সক্ষম। সমর্থ। সবে তিপ্পান্নয় পা দিয়েছেন। ঘোড়ার পিঠে চড়ে একদমে তখনও তিনি পাহাড়ের চুড়োয় উঠতে পারেন। শ পাঁচেক সৈনিকের মহড়া নেবার মতন তাকৎ তখনও তাঁর রয়েছে। বিশাল এক মহীরুহের মতন তিনি ছিলেন খাড়া। অটল। তাঁকে টলাবার সাধ্য হিন্দুস্তানের বাদশারও ছিল না। তা সেই মহীরুহই কুপোকাৎ হয়ে গেল কয়েক মাসের ভেতর। শোনা যায়, শিবাজীর শেষ লুণ্ঠনই ছিল তাঁর এই অকস্মাৎ পতনের কারণ।

শহর লুঠ করে ভালই ধনসম্পদ পেয়েছিলেন শিবাজী। পেয়েছিলেন অপরিমিত সোনা। রাশি রাশি রুপো। আর হিরেমুক্তো যা পেয়েছিলেন, তা একশো পেটিকারও অধিক। এছাড়া ছিল, মহার্ঘ বস্ত্রের সম্ভার। সেনা হাতি-ঘোড়া। আর বিস্তর উট। প্রকৃতপক্ষে ওইসব জন্তু জানোয়ারের পিঠে চাপিয়েই ওই অঢেল ঐশ্বর্য নিয়ে শিবাজীর দেশে ফেরা সহজ হয়েছিল। গোল বাধল পথে। গুপ্তচরেরা হঠাৎ এসে জানাল, মুঘলরা শিবাজীকে ঘিরে বিরাট এক পরিধি জুড়ে তৈরি করেছে এক চক্রব্যূহ। তা ভেদ করে দেশে ফেরা অসম্ভব। তাদের প্রতিটি ঘাটি সুসজ্জিত। কামান-বন্দুকেরও অভাব নেই।

শিবাজী স্বগতোক্তির মতো বলে উঠলেন, 'উপায়?' গুপ্তচর বাহিরজী বললেন, 'উপায় একটা হয়ে যাবে মহারাজ। মুঘলদের জাল ছিঁড়ে বের হবার পথ একটাই আছে। কিন্তু সে পথ বড় দুর্গম। মহারাজ শিবাজী যদি দুঃসহ কষ্টের কাজে নিজেকে নিয়োগ করতে রাজি থাকেন, তা হলে এখনই সে পথ ধরে আমাদের এগোতে হবে।'

ভ্রূ-কুঞ্চিত করে শিবাজী বললেন, 'আমাদের গতিবিধি শত্রুরা নজর রাখছে না? যদি তারা আমাদের ওপর নজর রাখে, তা হলে এই দিনের আলোয় গোপন পথে রওনা দেওয়া কি ঠিক হবে?'

'ঠিকই বলেছেন মহারাজ। তবে এই মুহূর্তে মুঘল গুপ্তচরের নজর আমাদের ওপর নেই। আমরা এখন যে পথ ধরে রওনা দেব, সন্ধ্যার পর সকলে আমরা সে পথে যাব না। রাতের আঁধারে পথ বদল হবে। সেনাপতি হাম্বির রাও যাবেন উত্তরের পথে। ওই পথে মুঘলদের সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষ অনিবার্য। আর মহারাজ স্বয়ং যাবেন পশ্চিমের পথে। এ পথ বড় দুর্গম। জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড় ডিঙিয়ে গিরিসঙ্কটের ভেতর দিয়ে তিনদিন তিন রাত্তির অবিরাম চলতে হবে। মহারাজের সঙ্গে ধনরত্ন যাবে।'

'ওই পাহাড় পেরিয়ে আমরা কোথায় পৌঁছব?'

'পাট্টাগড়ে। ওই গড় সুরক্ষিত। মুঘলদের হাতের বাইরে। এই গড়ের বৃত্তান্ত মহারাজের নিশ্চয় অজানা নয়।'

'না।' হাসলেন শিবাজী; 'ওই গড় থেকে রায়গড় খুব একটা দূরে নয়। তবে এ পথ বড়ই দুর্গম। যাই হোক, এই ঝামেলা কাটিয়ে যে ভাবেই হোক আমাদের দেশে ফিরতেই হবে। কিন্তু এই ঝামেলার ব্যাপারে আমার সামান্য একটি কৌতূহল আছে।

'ফকির সৈয়দ জান মহম্মদ কি আমাদের এই বিপদে ফেলার ব্যাপারে লিপ্ত আছে?'

গুপ্তচর বাহির ভট্ট একটুখানি ভাববার সময় নিলেন। পরে বললেন, 'না মহারাজ। ফকির সাহেব নিজের সাধন ভজন নিয়ে থাকেন। রাজনীতি করেন না।'

'রুষ্ট ফকির আমাকে তা হলে শুধু শুধুই ছেড়ে দিয়েছে, বলতে চাও?'

'একরকম তাই মহারাজ। তবে শুনেছি, দারুণ মনোব্যথা পেয়ে শেষটায় তিনি আপনাকে অভিসম্পাত করেছেন। ব্যস্, ওই পর্যন্তই।'

'কী অভিসম্পাত করলেন?'

'অভিসম্পাত দিয়েছেন, ছ'মাসের ভেতর মহারাজের এন্তেকাল হবে।'

'ছ'মাসের ভেতর?' হা-হা করে হেসে উঠলেন শিবাজী।

কিন্তু গড়পাট্টাতে পৌঁছতে শিবাজীর যে শারীরিক ধকল হল, তা অবর্ণনীয়। পাহাড়টির গায়ে কোনও পথ ছিল না। ছিল শুধু কাঁটার জঙ্গল। আর যেখানে কাঁটা ছিল না, সেখানে ছিল ন্যাড়া পাথর। বিশাল বিশাল পাথর খাড়া হয়ে লেগে আছে পাহাড়ের গায়ে। ঘোড়া নিয়ে সে পথে ওঠা যায় না। তবু সেই পথ পাড়ি দিতে হল। অঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হল। পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়ে কয়েকটি উটের এন্তেকাল হল। তৃষ্ণায় ছাতি ফাটল। রাতের আঁধারে অবিরাম হোঁচট খেতে হল। বেশ কয়েকটি রত্নপেটিকা খোয়া গেল, তারা গড়িয়ে পড়ে গেল পাহাড়ের নীচে। কাঁটা ঝোপের জঙ্গলে ঝুলতে থাকল। এদিকে মুঘলদের সঙ্গে সংঘর্ষে সেনাপতি হাম্বির রাও খোয়ালেন চার হাজার অশ্বারোহী সৈনিক।

শিবাজীর জীবনের এ কাহিনী বারবার শুনেছেন শাহুজী। শুনেছেন আর রোমাঞ্চিত হয়েছেন। মা বলতেন, 'আমার শ্বশুর ছিলেন মহাপুরুষ। জেনেশুনে জীবনে কখনও তিনি পাপ করেননি। তা তাঁর পরিণাম অমন হবে কেন? ফকিরের অভিশাপে একটা কাকও মরে না। তা সেই ফকিরের অভিশাপ তাঁকে লাগবে কী করে? আসলে মানুষটা মরবার অনেক আগেই ভেতরে ভেতরে মরে গিয়েছিলেন। আর এর কারণ ছিল তোর বাপ্।'

ছেলেকে শেষের দিকে একেবারেই সহ্য করতে পারছিলেন না শিবাজী। নিজের অবর্তমানে ওই অপোগণ্ড সিংহাসনে বসে আছে, এ কথা চিন্তা করতেই, তাঁর গায়ে জ্বর আসত। চোখের সামনে দেখতেন, তাঁর স্বপ্নের মারাঠা-রাজ্য ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে। সারা মুলুক জুড়ে চলেছে কেবল নাচ-গানের হর্‌রা। ঘরে ঘরে বইছে শরাবের বন্যা। মারাঠাদের দেশে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে মুঘলরা।

রায়গড়ে থাকবার সময় একদিন শিবাজী ডেকে পাঠালেন তাঁর প্রধান কয়েকজন সেনাপতিকে। এঁদের মাথা আন্নাজী এসে প্রভুর পাশে দাঁড়ালেন। কয়েকদিন ধরেই শরীর ভাল যাচ্ছে না। সারা শরীর জুড়ে কিসের যেন এক অবসাদ। অবসন্ন গলায় শিবাজী বললেন, 'আন্নাজী, তোমাদের কেন আজ আমি ডেকে পাঠিয়েছি, জানো?'

'না মহারাজ।'

'আমার দিন ফুরিয়ে আসছে আন্না। আমার অবর্তমানে কী হবে, তার হুকুম আমি আগে থাকতেই দিতে চাই।'

সেনাপতিরা বলে উঠলেন, 'আপনি আমাদের মাঝখানে থাকবেন না, এ কেমন করে হয়? আপনার আসন্ন মৃত্যুর কথা কোনও জ্যোতিষ বলেছে?'

'কোনও জ্যোতিষ নয়, আন্নাজী। আমি নিজেই ভেতর থেকে টের পাচ্ছি, আমার দিন ফুরিয়ে আসছে।' মৃদু হাসলেন শিবাজী। 'আমার অবর্তমানে আমার পুত্র শম্ভুকে তোমরা রাজতখ্‌তে বসাও, তা আমি চাই না। সে ভোগী। অসংযমী। নেশাখোর। তাকে মারাঠাদের রাজসিংহাসনে বসালে দেশ উচ্ছন্নে যাবে।'

'কিন্তু কাকে আপনি রাজসিংহাসনে দেখতে চান? রানি সয়রা বাঈয়ের গর্ভজাত পুত্র রাজারাম হবে আপনার উত্তরাধিকারী?'

'মন্দ কী।'

'কিন্তু রাজারাম যে নাবালক।'

'নাবালক বলেই বিশেষ সুবিধা হবে আন্নাভাই। তাকে তোমরা গড়ে পিটে নিতে পারবে।'

'আপনার যেমন ইচ্ছা।'

দেখতে দেখতে তাঁর দেহ-মনে নেমে এল যোগীর ভাব। সেবার শীত পেরিয়ে এল বসন্ত। নব বসন্তে ফুলে ফুলে ছেয়ে গেল পাহাড়ি গাছগুলি। পাখির কাকলিতে ভরে উঠল বনস্থলী। কিন্তু সেই বসন্ত শিবাজীকে স্পর্শও করতে পারল না। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। রক্তদাস্ত আর ধুম জ্বরে তিনি শয্যাশায়ী হলেন। জ্বরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলল রক্ত পায়খানা। দুর্বল হয়ে পড়লেন শিবাজী। গলার স্বর ক্ষীণ হয়ে পড়ল।

সেনাপতিরা উদ্বিগ্ন। কবিরাজদের নিভৃতে ডেকে নিয়ে গিয়ে তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেমন বুঝছেন?'

'বুঝতে পারছি না। কোনও দাওয়াই কাজ করছে না।'

যুবরাজ শম্ভুজী মাঝেমাঝেই আসতে থাকলেন বাপের কাছে। আর মাঝেমাঝেই হুঙ্কার ছাড়তে থাকলেন, 'অসুখ না হাতি? আমার বাবাকে কৌশলে বিষ খাওয়ানো হয়েছে। আর কেন খাওয়ানো হয়েছে, তা আমি জানি। রাজ-সিংহাসন দখলের জন্য।'

সেনাপতি আন্না বললেন, 'মহারাজ শিবাজীকে বিষ খাওয়ানো হয়েছে,

একথা আমি বিশ্বাস করি না।'

'আমি কোনও আন্দাজের কথা বলছি না। আমার কাছে প্রমাণ আছে।'

কথাগুলি বলে শম্ভুজী আর এক মুহূর্তের জন্যও দাঁড়ালেন না। রায়গড় থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেলেন।

বারো দিনের দিন শিবাজীর অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে গেল। সারা দেহ জুড়ে নামল কাঁপুনি। সেদিন পূর্ণিমা। চৈত্রের চাঁদ পাহাড়ি অরণ্যে মায়াজাল বিস্তার করল। বাতাসে ঈষৎ গরমের ছোঁয়া। মহারাষ্ট্রকেশরী, মারাঠা জাতির রাজা ধীরে ধীরে তাঁর চোখ দুটি বন্ধ করলেন। মৃত্যুর কালো ছায়া তাঁকে গ্রাস করল। তবে শেষের সময়টিতে বিড়বিড় করে বলে গেলেন, 'তোমাদের কাছে আমার প্রিয় জন্মভূমিকে রেখে গেলাম। রেখে গেলাম রাজ-সিংহাসন। আমি মা ভবানীর পায়ে আশ্রয় নিতে চললাম।'

শিবাজী মহারাজ চলে গেলেন।

আকস্মিক দৈব দুর্বিপাক, ঝড়ঝঞ্ঝা। এমনকি ভূমিকম্পও যে ক্ষতি করতে পারে না, শিবাজীর মৃত্যুতে সেই অভাবিত ক্ষতি হয়ে গেল মারাঠাদের। সারা দেশ কেঁদে উঠল। তামাম মুলুক হল পিতৃহারা। ওদিকে মুঘল শিবিরে বাজতে থাকল জয়ডঙ্কা। দিল্লি প্রাসাদকূটে যখন এই সংবাদ পৌঁছল, তখন বাদশা ঔরংজেবের মুখে একই সঙ্গে নেমে এল হর্ষ এবং বিষাদ। শিবাজীকে বাদশা মহাবীর মনে করতেন।

এদিকে শিবাজীর মৃত্যুতে মহারাষ্ট্র শোকে আচ্ছন্ন হলেও, শিবাজীর সেনাপতিরা তাঁদের ইতিকর্তব্য ভুললেন না। তাঁরা বিনা দ্বিধায় মহারাষ্ট্রের তখ্‌তে বসিয়ে দিলেন শিবাজী মহারাজের নাবালক পুত্র রাজারামকে। রাজারামের বয়স তখন সবে দশ। রায়গড় দুর্গে এই নতুন অভিষেক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হল। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকলেন শিবাজীর সব মন্ত্রীরা। তবে প্রধান উদ্যোগ যিনি নিলেন, তিনি হলেন আন্নাজী দত্ত।

খবর শুনে রাগে ক্ষোভে জ্বলে উঠলেন শম্ভুজী। হাতে মুঠো পাকিয়ে বাতাসে বার কয়েক ঘুষি ছুঁড়ে বললেন, 'আমি এই অভিষেক মানি না। আমাকে বঞ্চিত করবার জন্য এ এক গভীর ষড়যন্ত্র। আমার হক পাওনা থেকে আমাকে হটিয়ে দেবার জন্য সেনাপতিদের এ এক কৌশল। এ কৌশল, এ মতলব আমাকে গুঁড়িয়ে দিতেই হবে।'

শম্ভুজী বৃথা দম্ভোক্তি করলেন না। তিনিও পাল্টা কৌশল করে বিস্তর লোককে নিজের দলে টানলেন। শিবাজীর নির্দেশ অনেকেই শুনে গেছেন। কয়েকজন সেনাপতি পর্যন্ত ধীরে ধীরে ভিড়ে গেলেন শম্ভুজীর দলে। শিবাজীর আমলে ব্রাহ্মণদের সম্মান ছিল অতিরিক্ত রকমের বেশি। এই অতিরিক্ত সম্মানে অনেকের মনেই ছিল চাপা ক্ষোভ। শম্ভুজী এই ক্ষোভের সুযোগ নিলেন। এছাড়া লুঠের বখেরা নিয়েও ছোটখাটো সৈনিকদের মনে মেলা অভিযোগ ছিল, তাদের অভিযোগের সুবিচার হবে বলে আশ্বাস দিলেন শম্ভুজী।

শিবাজীর মৃত্যুর পর সতেরো দিনের মাথায় রাজারামের অভিষেক হয়েছিল। এরপর দু'মাস গড়াতে না গড়াতেই সেনাপতি আন্না গেলেন শম্ভুজীর কাছে। দুর্গ পানহানায়। কিন্তু শম্ভুজীর কৌশলে বন্দি হলেন। বন্দি হবার পরে নিক্ষিপ্ত হলেন কারাগারে। ইতিমধ্যে মহারাষ্ট্রের নতুন রাজা হিসেবে অভিষেক হল শম্ভুজীর। তিনি বিশ হাজার সৈন্য নিয়ে হানা দিলেন রায়গড়। বিনা প্রতিরোধে রায়গড়ের পতন হল। শিবাজীর মৃত্যুর একশ ছয় সাতদিনের মাথায় মারাঠা জাতির ইতিহাসটাই ওলটপালট হয়ে গেল। রাজারাম বন্দি হলেন। রাজারামের মা সয়রা বাঈ অভিযুক্ত হলেন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি নাকি নিজের ছেলেকে রাজতখ্তে বসাবার জন্য শিবাজীকে বিষ খাইয়েছেন। আর বিষ পানের ফলেই শিবাজীর মৃত্যু। এই অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁর শাস্তি হল বেদনাদায়ক মৃত্যুর। তবে দণ্ড কেমন করে দেওয়া হল, তা বাইরে প্রকাশ করা হল না। সুতরাং গুজব রটল। কেউ বলল, 'রানিমাকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলা হল।' কেউ বলল, 'বিষ নয়, অনাহার। খাবার এবং পানীয় বন্ধ করে রানিমাকে এক অন্ধ চোরকুঠরির ভেতর ঢুকিয়ে মেরে ফেলা হয়েছে।'

মারাঠাবাসীরা রানিমার ওই মৃত্যুর খবর শুনল। কেউ কেউ দুঃখ পেল। কিন্তু বেশির ভাগ লোকই কোনও মন্তব্য করতে ভরসা পেল না। চুপচাপ থেকে গেল। শিবাজীর স্বপ্নের রাজত্ব একটু একটু করে হারিয়ে যেতে থাকল। মারাঠী সেনাপতিরা দ্বিধায় পড়লেন। কেউ হাত গুটিয়ে বসে রইলেন। আবার কেউ-বা প্রবল উৎসাহে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। পাশের মুঘল অধিকৃত দেশগুলিতে চলতে থাকল লুঠতরাজ। নতুন রাজা শম্ভুজী প্রতি সন্ধ্যায় তাঁর নাচমহলে তয়ফাবিবিদের নিয়ে মেতে উঠলেন। শরাবের নেশায় বুঁদ হয়ে গেলেন।

ইতিমধ্যে ভারি একটা মজার ঘটনা ঘটল। ঘটনাটি ঘটল শম্ভুজীর মহা অভিষেকের কয়েকদিন আগেই। পাকাপাকিভাবে তখ্ত দখলের পর শম্ভুজীর মনে হল, এবার তাঁর অভিষেক অনুষ্ঠানটি বেশ জাঁক জমক করে করা দরকার। পানহানায় নয়, অভিষেক অনুষ্ঠানটি সাড়ম্বরে হওয়া দরকার রায়গড় প্রাসাদে।

একদিন অপরাহ্নে ইয়ার বকশিদের নিয়ে রাজ-উদ্যানে বিশ্রম্ভালাপে সময় কাটাচ্ছেন শম্ভুজী, হঠাৎ এক তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর আবির্ভাব। বিশাল চেহারার মানুষ। সকলের অলক্ষে রাজার উদ্যানে কী ভাবে যে উনি প্রবেশ করলেন, তা ঠাহর করা গেল না।

'বোম বোম বভম্ বোম। মহারাজ শম্ভুজীর জয় হোক। বভম্ বোম্ মহারাজ দীর্ঘজীবী হোন।'

লোকটির অঙ্গে ঘোর রক্তবর্ণের পোশাক। হাতে ত্রিশূল। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। চেহারার মতোই লোকটার গলা বেশ ভারি। চোখ দুটি বড় বড়। লাল রঙের।

'মহারাজের সুসন্তান হোক।'
শম্ভুজী বললেন, 'কে আপনি? হঠাৎ এখানে এলেন কী করে?'
'কে আমি?' সন্ন্যাসী হা-হা করে হেসে উঠলেন। 'আমি একজন তান্ত্রিক সন্ন্যাসী কনৌজী ব্রাহ্মণ। ইলাহাবাদে গঙ্গার ধারে বসে সাধন-ভজন করছিলাম। একাই ছিলাম। বেশ আনন্দে ছিলাম। তা আনন্দে থাকতে দেয় কে? আমাকে ঘাড় ধরে এখানে উনি পাঠিয়ে দিলেন। বললেন, যা ব্যাটা রায়গড় চলে যা। এখনই যা। সেখানে তোর বিস্তর কাজ।'
'কে পাঠালে?'
'পাঠাল যে, তার আশীর্বাদ মহারাজের ওপর নিঃশব্দে বর্ষিত হচ্ছে।'
'আপনি কোন দেবতার কথা বলছেন? আপনি মহাদেবের দাস?'
'আপনার 'শম্ভুজী' নাম সত্যিই সার্থক! মহারাজের হুকুম পেলে আমি এখানে এক মহাযজ্ঞের আয়োজন করি। মহাশক্তি মহাকালীকে আমি এখানে জাগিয়ে তুলব।'
প্রথম দিকে এই ভাবেই পরিচয় শুরু। প্রথম দিনের পরিচয়েই শম্ভুজী ওই অভিনব মানুষটির প্রতি আকৃষ্ট হলেন। পিঁপড়ে যেমন চিটেগুড়ে আটকে যায়, অনেকটা সেইরকম। তা সেই যে আটকে গেলেন, আর বের হতে পারলেন না ওই সাধুর হাত থেকে।
সাড়ম্বরে অভিষেক হল। অভিষেকের পর অনুষ্ঠিত হল মহাযজ্ঞ। মন মন ঘি পুড়ল। সাধু-সন্ন্যাসীদের আগমনে রাজপ্রাসাদ পবিত্র হল। বিস্তর শাস্ত্র পাঠ হল। দান ধ্যান ইত্যাদি চলল মাসাধিককাল ধরে। — মহাযজ্ঞে মহা আহুতি দেবার পর তান্ত্রিক সন্ন্যাসী ঘোষণা করলেন, 'মহারাজ। আপনার শুভ কামনায় এ মহাযজ্ঞ সার্থক হয়েছে। মহাশক্তি মহাকালী ভারি সন্তুষ্ট হয়েছেন। আপনার অভীষ্ট পূর্ণ হবে। আপনার বংশ উজ্জ্বল করে শিগগির একটি সুসন্তানের জন্ম হবে।'
'সুসন্তান?'
'হ্যাঁ মহারাজ। আপনাদের উপযুক্ত সন্তান আসছেন। তা তিনি আপনার পিতৃদেবও হতে পারেন। মুঘলদের হাত থেকে তিনি ছিনিয়ে নেবেন হিন্দুস্তানের শাসন ভার।'
তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর কথা শুনে ভারি খুশি হলেন শম্ভুজী। তাঁর নিজের ভেতর আত্মবিশ্বাস বাড়ল। মনে হল, আমি নিজেই-বা কম কিসের? আমি মুঘলদের সঙ্গে টেক্কা দিতে পারব না? শম্ভুজী সন্ন্যাসীকে প্রণাম করে বললেন, 'সাধুজী, আমি মুঘলদের জব্দ করতে পারব না?'
'পারবেন। অবশ্যই পারবেন। বভম্ ব্যোম্। মহাশক্তি মহাকালী আপনার সহায়। দেবী ভবানী যার সহায়, তার চিন্তা কী।'
এইভাবে তান্ত্রিক সন্ন্যাসী যত শক্তিসঞ্চারী কথা বলেন, ততই আত্মশক্তিতে ভরপুর হয়ে ওঠেন রাজা শম্ভুজী। সন্ন্যাসীর কিছু কিছু কথা

ফলে যেতেও দেখা গেল। এক বছরের মাথায় রানি যেসু বাঈয়ের একটি ছেলেও হল। ইনিই হলেন শাহুজী।

তান্ত্রিক সাধু ত্রিশূল হাতে নাচতে আরম্ভ করলেন, 'এসে গেছে। মহাশক্তির কৃপায় শত্রুদমন মুঘলধ্বংসকারী মহাশিশুর আবির্ভাব হয়েছে। কংসারি মধুসূদন যেমন এসেছিলেন, এ শিশুর আবির্ভাবও তেমনি। হিন্দুস্তানকে ইনি কলুষমুক্ত করে পবিত্রস্থানে পরিণত করবেন।'

'সত্যি ?' —শম্ভুজীর চোখে মুখে বিস্ময়। কেবল ভবিষ্যবাণীর জন্য নয়, ভবিষ্যৎ বক্তার দিকে তাকিয়েও বিস্ময়ের শেষ পান না শম্ভুজী। তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর কথা নিয়ে এতদিন ধরে অনেক আঁক কষেছেন তিনি। অনেক স্বপ্ন দেখেছেন। কিন্তু মানুষটির দিকে তাকিয়ে কখনও এভাবে শম্ভুজী খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেননি। আজ দেখলেন। দেখে স্তম্ভিত হলেন। আরে, সাধুর চেহারায় যে শিবের আদল। তসবিরে আঁকা শিবের চেহারার সঙ্গে আশ্চর্য এঁর মিল। শম্ভুজী যতই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেন, ততই বিস্মিত হন। কৈলাশবাসী শিব কি তাঁর ঘরে আজ নেমে এলেন। আগের রাতে নেশা করেছিলেন শম্ভুজী। সেই নেশার রেশ বোধহয় এখনও তাঁর মধ্যে ছিল। সাধুকে আরও খানিক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে হাউ হাউ করে কেঁদে শম্ভুজী জড়িয়ে ধরলেন তাঁর পা। কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'আপনাকে এতদিন আমি চিনতে পারিনি ঠাকুর। আমাকে ঠিক করে বলুন, কে আপনি ?'

'আমাকে, মহারাজ, 'কবি-কালাশ' বলে ডাকবেন।'

কবি-কালাশের সাধের সেই শিশুটি হল শাহুজী নিজে। মুঘল অবরোধে থাকবার সময় রানি যেশু বাঈ এই অলৌকিক গল্পটি বহুবার বলেছেন।

'মা, আমি যদি সত্যি সত্যিই ঈশ্বরের প্রেরিত মহাশক্তিধর শিশু হই, তা হলে এভাবে যবন মুঘলদের কারাগারে বন্দি কেন ?'

'সবই ঈশ্বরের বিধান বাবা। যিনি তোমাকে রাজসন্তান করে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, তিনিই আবার তোমাকে এভাবে কারাগারে বন্দি করে রেখেছেন। তবে এসব ক্রিয়াকর্মের পিছনে একটা পাপ আছে। সে পাপ তোমার আমার কারো নয়। তোমার বাপের পাপ। তোমার বাপের পাপেই এ হেনস্থা।'

কথাটি মিথ্যে বলেননি যেশুবাঈ। ভোগী ও অক্ষম মানুষের দুরাকাঙ্ক্ষার পরিণতি যেমন হয়, ঠিক সেই ধরনের পরিণতিই হয়েছিল শম্ভুজীর। কবি-কালাশের উদ্দীপক কথার ঠাট-ঠমকে শম্ভুজীর ধারণা হয়েছিল যে তিনি অজেয়। তাঁকে পরাজিত করতে পারে এমন শক্তি পৃথিবীতে নেই। তা দক্ষিণ ভারতে রাজনৈতিক শক্তির পরিবর্তিত বিন্যাসটাও তিনি বুঝে উঠতে পারেননি। বুঝতে পারেননি, পরিস্থিতির কী ভাবে বদল হচ্ছে দিনে দিনে।

কবি-কালাশের শক্তিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে মুঘল রাজত্বে মাঝে মাঝেই তিনি হানা দিয়ে চলেছিলেন। লুণ্ঠন করে নিয়ে আসছিলেন প্রভূত ধনরত্ন। কেবল

মুঘলদের রাজ্যেই হানা দিয়ে বসে থাকলেন না শম্ভুজী। হানা দিলেন পর্তুগিজ অধিকৃত ভূখণ্ডেও। গোয়া-দমনেও তিনি মারাঠা-পতাকা উড়িয়ে গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে প্রচুর টাকা পয়সা লুঠ করে আনলেন। এই সময় আরও একটি অভাবিত ঘটনা ঘটল। বাদশার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তাঁর এক পুত্র শাহাজাদা আকবর তাঁর সৈন্যদল নিয়ে মারাঠারাজ শম্ভুজীর আশ্রয় চাইলেন। শাহাজাদা আকবর কেবল আশ্রয় পেয়েই সন্তুষ্ট হলেন না, তিনি মারাঠা শক্তির সহায়তায় বাদশা ঔরংজেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামতেও চাইলেন। চাইলেন বাদশাকে হঠিয়ে দিয়ে তখ্‌ত দখল করতে।

শাহাজাদা আকবরের প্রস্তাব শুনে কবি-কালাশ বললেন, 'মতলবটা মন্দ নয়। তবে ঝুঁকি নেবার আগে গ্রহ-সন্নিবেশটা বিচার করে দেখতে হবে।'

শম্ভুজী শাহাজাদা আকবরের প্রস্তাবে খুশিতে ডগমগ। নিজের পছন্দমতো একজন মানুষকে হিন্দুস্তানের বাদশার তখ্‌তে পাওয়া কি চারটিখানি কথা। তবে বাদশা ঔরংজেবের সঙ্গে লড়াই করাটা যে সহজ ব্যাপার নয়, তাও বুঝলেন শম্ভুজী। কাজটা বড় ঝুঁকির। বাদশার সঙ্গে লড়াই করতে হলে আরও মেলা সেনা দরকার। দরকার কামান বন্দুকের। আর দরকার সমতলভূমিতে লড়াই করবার মতো দক্ষ প্রচুর সৈনিকের। পাহাড়ি জঙ্গলে লড়াইয়ের বিদ্যা দিয়ে কুলোবে না।

শাহাজাদা একা পালিয়ে আসেননি। তাঁর সঙ্গে এসেছেন বেগম সাহেবা। এসেছে বেশ কয়েকটি ফুটফুটে ছেলেমেয়ে। এছাড়া এক দঙ্গল বাঁদি আর নফর তো আছেই। এঁদের জন্য রাজপ্রাসাদের বিশাল একটি অংশ ছেড়ে দেওয়া হল। এইভাবে গড়িয়ে গেল কিছুদিন। তবে তাঁদের সুবিধার জন্য ঠাঁই পরিবর্তন করতে হল। মাস কয়েক পরে মুলুক রত্নগিরির এক নিভৃত নিকেতনে এঁদের ঠাঁই করে দেওয়া হল। রত্নগিরি থেকে মাঝে মাঝে ডাক পড়ে কবি-কালাশের। শাহাজাদা আকবর জানতে চান, বাদশার সঙ্গে লড়াইটা কবে হবে? গ্রহ-সন্নিবেশ কী বলে?

কথায় আছে, বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা। তা আঠারো ঘা না হোক, শাহাজাদার ছোঁয়া লাগলে বাদশার রক্তচক্ষু যে কী ভয়ঙ্কর, এবং তার ঘা যে কত বেশি, তা কিছুদিন পর থেকেই টের পেতে থাকলেন শম্ভুজী। মারাঠাদের ব্যাপারে এতদিন তিনি কিছুটা উদাসীন ছিলেন, এখন সে উদাসীনতা চট্‌ করে ছুটে গেল। তিনি এবার মাঝে মাঝেই বিশেষ বিশেষ বাহিনী পাঠাতে থাকলেন মারাঠা ভূমিতে। শাহাজাদা শাহ আলম এলেন বিরাট ফৌজ নিয়ে। দক্ষিণ কোঙ্কনে তিনি হানা দিলেন। রামঘাট গিরিসঙ্কট পেরিয়ে তিনি মারাঠাদের দেশে ঢুকে পড়লেন। মারাঠাদের হাত থেকে পাকা ফলের মতো একটির পর একটি গিরিদুর্গ খসে পড়তে থাকল। হঠাৎ এক হানাদারিতে শম্ভুজীর দুই স্ত্রী, একটি কন্যা এবং তিনটি বাঁদি ধরাও পড়ল মুঘলদের হাতে।

'এ কী হল কবি-কালাশ, আমাদের ইজ্জৎ যে ভূ-লুণ্ঠিত হল। যবনদের হাতে ধরা পড়ল আমার মেয়ে বৌ!'

'সবই গ্রহের ফের মহারাজ! শনি বক্রী হলে এমন ইজ্জৎহানি হয়। ভয় পাবার কিছু নেই। ইজ্জৎ আবার ফিরে আসবে।'

ইতিমধ্যে শাহাজাদা আকবর মারাঠা-রাজ শম্ভুজীর ওপর ভরসা করতে না পেরে নিজেই একবার যুদ্ধে নেমে পড়লেন। সুবিধা করতে পারলেন না। শেষে স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের সকলকে ফেলে রেখে দেশত্যাগী হলেন। পালিয়ে গেলেন পারস্য দেশে। হাজির হলেন গিয়ে ইসপাহানে সুলতানের দরবারে। এদিকে শাহাজাদার ছেলেমেয়েরা ছিটকে পড়ল নানান জায়গায়। কেউ তাদের তেমন খোঁজ রাখল না।

তাড়া খেতে খেতে একদিন শম্ভুজী একটি নিভৃত গোপন আশ্রয় খুঁজে পেলেন। জায়গাটির নাম, সঙ্গমেশ্বর। অলকনন্দা আর বরুণা নদী এখানে এসে মিশেছে। চারদিকে নির্জন বনস্থলী। ইতিউতি দু-একটি কুটির। নগরী রত্নগিরি থেকে এগারো ক্রোশ দূরে। নগর জীবনের কোলাহল এখানে পৌঁছয় না। উঁচু একটি টিলার ওপর ছোট্ট একটি প্রাসাদ। রাজা-রাজড়াদের অবকাশ যাপনের জন্য নির্মিত। এই প্রাসাদেই গোপনে আস্তানা গাড়লেন শম্ভুজী। সঙ্গে রইলেন কবি-কালাশ। আর বাছাই করা কিছু সৈনিক এবং কয়েকজন সেনাপতি। কয়েকজনের সঙ্গে তাদের স্ত্রীরাও রইলেন।

শম্ভুজীর এই অবস্থান ছিল একান্ত গোপনীয়। কাক-পক্ষীতে টের পাওয়ার কথা নয়। কিন্তু কী আশ্চর্য, মুঘল দূতেরা টের পেলেন। তাঁরা পঁয়তাল্লিশ ক্রোশ দূরে অবস্থান করছিলেন। খবর পাবার সঙ্গে সঙ্গে তিনশ বাছাই করা অশ্বারোহী সৈনিক ঝড়ের বেগে রওনা দিলেন সঙ্গমেশ্বরের উদ্দেশে। এরপরের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত। প্রায় বিনা যুদ্ধেই ধরা পড়লেন শম্ভুজী। সঙ্গে সেই তান্ত্রিক সন্ন্যাসী।

বাহাদুর গড়ে তখন শাহী ছাউনি পড়েছে। সে ছাউনিতে বাদশা নিজে হাজির ছিলেন। শম্ভুজী আর কবি-কালাশের বিচারের জন্য বাদশা দরবার বসালেন। গাধার টুপি পরিয়ে, উটের পিঠে চাপিয়ে, ভাঁড়ের পোশাক পরিয়ে দু'জনকে আনা হল দরবারে। বিচারে দুজনেরই মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হল। সোজাসুজি মৃত্যু নয়। বেদনাময় মৃত্যু। যেদিন বিচার হল, সেই রাতেই শম্ভুজীর দুই চোখ অন্ধ করে দেওয়া হল। পরের দিন কবি-কালাশের জিবটা কেটে নেওয়া হল। পনেরো দিন ধরে চলল এই ধরনের নির্যাতন। এরপর তাঁদের পাঠিয়ে দেওয়া হল ভীমা নদীর তীরে অবস্থিত কোরে গাঁওয়ের শাহী ছাউনিতে। জায়গাটি পুনা থেকে ছয় ক্রোশ দূরে। সেখানে ওঁদের জীবন্ত অবস্থায় একটি একটি করে অঙ্গ কেটে খাওয়ানো হল ক্ষুধার্ত কুকুরকে। শেষে ওঁদের মাথাটি কেটে লাঠির ডগায় বিঁধে দক্ষিণ দেশের নগরে নগরে ঘোরানো হল। সঙ্গে বাজানো হতে থাকল জয়ডঙ্কা।

এরপরের ঘটনা খুবই প্রত্যাশিত এবং সংক্ষিপ্ত। শম্ভুজীর মৃত্যুর পরে ছয় মাসের ভেতরেই রায়গড় দুর্গে রাজবংশের সকলেই প্রায় ধরা পড়লেন মুঘলদের হাতে। এই ধৃতদের তালিকায় রইলেন শিবাজীর বিধবা স্ত্রীরাও। শম্ভুজী ও রাজারামের স্ত্রীরা। ছেলেমেয়ে, বিলকুল সব।

সাত বছরের ছোট্ট শিশু শাহুও বাদ গেলেন না। কবি-কালাশ যাঁকে যজ্ঞ করে স্বর্গ থেকে আনিয়েছিলেন, সেই শিশুও বন্দি হল যবনদের হাতে।

॥ তিন ॥

অভিষেক না অভিযান?

ঠিক তিন মাস পরে মনে পড়ল সেই মানুষটিকে।

মনে পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই আদেশ গেল তাঁর কাছে। তবে এই তিনমাসে শাহুজীর জীবনের ওপর দিয়ে যেন এক প্রবল ঝড় প্রবাহিত হয়ে গেল। সে ঝড়ের দাপটে যে কোনও সাধারণ মানুষ ধরাশায়ী হয়ে যেতে পারতেন। শাহুজী স্রেফ মনের জোরে টিকে গেলেন। পড়ে রইলেন মাটি কামড়ে। মারাঠা দেশ ছেড়ে চলে যাবেন না বলেই তিনি রয়ে গেছেন।

রাজমাতা তারাবাঈয়ের সঙ্গে সম্পর্কটা তিক্ত হয়ে উঠল। সেনাপতি ধনাজী যাদবের প্রবল উৎসাহে বড় বড় সেনাপতি একটু একটু করে তাঁর দলে এসে ভিড়েছেন। এসব সেনাপতিরা অভিজ্ঞ এবং সবরকম ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত। সিংহগড়, রাজগড়, তোরনা পানহানা ইত্যাদি দুর্গগুলি মুঘলদের কবলে পড়লেও, এঁরাই আবার তাদের পুনরুদ্ধার করেছেন। এইসব সেনাপতিদের ভেতর প্রধান হলেন মালহর, ঘোড়পারে, রাও ও যাদব। কেউ কারও থেকে কম নন। এঁরা শাহুজীকে আশ্বস্ত করলেন। দেখতে দেখতে বিশাল এক সৈন্যবাহিনী গড়ে উঠল। লড়াই আসন্ন। কিন্তু শাহুজীর মনে হয়, এ লড়াই কার সঙ্গে? কাকিমা তারাবাঈয়ের সঙ্গে? মুঘলদের হাত থেকে হিন্দুস্তানকে মুক্ত করবার জন্য এ লড়াই নয়?

তখন মনে পড়ে গেল সেই লোকটির কথা।

ধনা যাদবের কুঠিতে পৌঁছে গেল শাহুজীর দূত। পরের দিনই বিশাল একটি সাদা ঘোড়ায় চেপে দেখা দিলেন তিনি। ঈষৎ নত হয়ে রাজাকে নমস্কার করে তিনি নিজের উপস্থিতি ঘোষণা করলেন, 'মহারাজ। এ ব্রাহ্মণের নমস্কার গ্রহণ করুন। ভট্ট বালাজী আপনার তলব পেয়ে এক মুহূর্ত দেরি করেননি। তা হুজুর! আপনি আমাকে কোন কাজে লাগাবেন?'

'সৈন্য পরিচালনার কাজে। পাহাড়ি দুর্গগুলিকে একে একে অধিকারে আনতে হবে। তবে এ যুদ্ধ বিনা রক্তপাতে করতে হবে। নইলে এ যুদ্ধে মারাঠা সৈনিকরাই মরবে। আত্মঘাতী লড়াই আমি চাই না।'

'তারপর? গোটা মহারাষ্ট্রের রাজা হলে মহারাজের কী পরিকল্পনা।'

লোকটির দিকে শাহুজী এবার তাকিয়ে দেখলেন। চোখ দুটি যেন পাথরের। নিষ্প্রাণ। নিস্পন্দ। গলাতেও সেই ধাতব কণ্ঠস্বর। শাহুজী বলেন, 'রাজা না হয়ে রাজ্য পরিচালনার পরিকল্পনা কেউ করে না। তবে আমি করেছি। আমার ঠাকুর্দা ছত্রপতি শিবাজী যে মতলব নিয়ে রাজ্যপাট ফেঁদেছিলেন, আমিও সেই মতলব নিয়ে রাজ্য গড়ে তুলতে চাই। হিন্দুস্তান থেকে মুঘলদের হটাতে হবে একদিন।'

'শিবাজীর কথা বলছেন? কিন্তু তাঁর মতো মানুষ না হলে, কী করে তাঁর

আদর্শের রাজত্ব তৈরি হবে? রাজা শম্ভুজীরও ইচ্ছে ছিল, বাপের মতন কিছু একটা করেন। পঙ্গুদের ইচ্ছে হয় পাহাড় লঙ্ঘন করতে। কিন্তু কোনও পঙ্গুই তা পারে না। মাঝখান থেকে জোর করে পাহাড় ডিঙ্গুতে গিয়ে বেচারির জান চলে যায়। শম্ভুজী এই কারণে ফেঁসে গিয়েছিলেন। তা আপনিও যে ওইভাবে ফেঁসে যাবেন না, তার আগাম প্রতিশ্রুতি কে দেবে?'

'বাবার মতো শরাব আমি খেয়েছি বটে, বাঈজীও নাচিয়েছি। কিন্তু মদ আমায় খেতে পারেনি বা বাঈজীও আমায় নাচায়নি।'

ভট্ট বালাজীর চোখে আলো নেচে উঠল। 'মহারাজ যে খোলামেলা, তা তাঁর এই স্বীকারোক্তি থেকে বোঝা গেল। তা মহারাজ, প্রথম সাক্ষাতে আপনাকে আমি বলেছিলাম, মারাঠা দেশ এই মুহূর্তে শাসক হিসেবে একজন পুরুষ মানুষ চায়। খাঁটি পুরুষ। পুরুষবেশী কোনও নারী নয়। মহারাজ যে সেরকম একজন পুরুষ মানুষ, তা এই মুহূর্তে প্রমাণ দিতে পারবেন!'

'পারব। লড়াই করে। এবং আত্মঘাতী লড়াই থামিয়ে। আর যে জবাব আমি প্রজা সাধারণকে দেব, তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করব। এই মুলুকের হাল আমি ফেরাব। শান্তি প্রতিষ্ঠা করব। কঠোর হাতে দুর্নীতি দমন করব। আর এইসব কাজের জন্য আপনার সহযোগিতা চাই।'

'কিন্তু এই মুহূর্তে কিছু একটা করে দেখানো চাই যে!'

'এই মুহূর্তে মহারানি তারাবাঈয়ের কাছে আমি একজন দূত পাঠাতে চাই। সে দূত আপনি হলে ভাল হয়। গৃহযুদ্ধে না গিয়ে আমরা যদি তাঁর কাছে রাজ্যের এলাকা ভাগের প্রস্তাব দিই, তা কি সঙ্গত হবে না? এই ভাগ বাঁটোয়ারার শর্ত হল মুঘলদের সঙ্গে নিয়ত সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া।'

'উত্তম। আপনার এই সাধু উদ্দেশ্যের কথা মারাঠাবাসীরা জানতে পারলে খুশিই হবে। তবে মুঘলরা জানতে পারলে কিন্তু আপনার বিপদ বাড়বে। কারণ বিবাদ বাধাতেই তারা আপনাকে এই মুলুকে পাঠিয়েছে। আমাদের তাই নতুন কৌশল নিতে হবে। আমরা কোন পথে এগোচ্ছি, তা তাদের বুঝতে দিলে হবে না। বরং উল্টোটাই বোঝাতে হবে।'

'এতে লোকে আমায় ভুল বুঝবে না তো?'

'আপনি যদি সত্যি সত্যিই দেশের কাজে নিজেকে উৎসর্গ করেন, তা হলে দেশ আপনাকে কখনও চিনে নিতে ভুলবে না। আর আপনি যদি সত্য সত্যই আমার ওপর নির্ভর করেন, তা হলে আমাকে অনুসরণ করুন।'

'এখন তাহলে কী কর্তব্য?'

'আপনি আমাকে প্রথমে সেনাপতির দায়িত্ব দিন। তারপরে পেশোয়া করুন।'

'আর আমি?'

ধাতব যন্ত্রে এবার হাসির রোল শোনা গেল, 'আপনার আপাতত কোনও

দায়িত্বই নেই। আপনি লোক দেখিয়ে আমোদ আর ফুর্তি করুন। বিশালগড় বড়ই সুরক্ষিত দুর্গ। সেখানে গিয়ে আনন্দে মাতোয়ারা হোন। শরাব আর বাঈজীদের নিয়ে মেতে উঠুন। আর আমি সৈন্যবাহিনী নিয়ে মারাঠা মুলুকের নোংরা পরিষ্কারে লেগে যাই। রাজা শম্ভুজী, রাজা রাজারাম এবং এই শেষের দিকে রানি তারাবাঈ যে যে ময়লা জমিয়েছেন, তা সাফা করতে কিছু সময় লাগবে। ময়লা সাফ হলে আপনার কাজ শুরু হবে।'

ভট্ট বালাজীর সঙ্গে এই যে কথা হল, এরপর আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি শাহুজীকে। বালাজীর নির্দেশ মতো শাহুজী চলে এলেন পাহাড়ি দুর্গ বিশালগড়ে। বিশালগড় কেবল সুরক্ষিত নয়, জায়গা হিসাবেও ভারি মনোরম। সহ্যাদ্রি পাহাড়ের উঁচু একটি শৃঙ্গের ওপর। সাগরতল থেকে সাড়ে তিন হাজার ফুট উঁচু। পশ্চিমে অদূরে রয়েছে কোঙ্কনের সমতল ভূমি। উত্তর পশ্চিমে সতেরো আঠারো ক্রোশ দূরে কোলাপুরের রত্নখনি তখন থেকেই বিখ্যাত।

পাহাড়টা বড় খাড়াই। এত খাড়াই যে আজও ভাল করে কোনও পাহাড়ি পথ তৈরি হয়নি। তিন ক্রোশ দূর থেকে পাথর আরম্ভ। এই পথের নাম, 'অম্বা গিরিপথ'। ক্রোশ চারেক ঘুরে ঘুরে পথ এসে পৌঁছেছে পাহাড়ের শীর্ষে। পথের চারদিকে নিবিড় অরণ্য। বর্ষাকালে এই পথ ধরেই নামে পাহাড়ি ঝোরা। পথে সে সময় ঘোড়া চলে না। উটও ভয় খায় ওপরে পা বাড়াতে। বর্ষায় একবার কিছু মাল চালান করার ব্যবস্থা হয়েছিল খচ্চরদের পিঠে চাপিয়ে. খচ্চর ও মাল — দুই ডুবে গিয়েছিল গিরিপথের তরল কাদায়। শিবাজীর এই দুর্গ প্রাকৃতিক কারণেই সুরক্ষিত। মারাঠাদের দখলেই বরাবর রয়েছে। কেবল একবার এটিকে দখলে এনেছিলেন বাদশা ঔরংজেব। কিন্তু বেশি দিন ধরে রাখতে পারেননি। মারাঠারা তাঁর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল।

সহ্যাদ্রির যে শিখরটিতে দুর্গ-প্রাসাদ গড়ে উঠেছে, তা অনেকখানি প্রশস্ত। প্রশস্ত বলেই প্রাসাদের আকার বড়। এ প্রাসাদের একদিকে রয়েছে দরবার গৃহ। রাজার নিজস্ব প্রাসাদ। রানি মহল। নাচ মহল। উদ্যান। বাঁদি আর বিবিদের জন্যও পৃথক থাকার ব্যবস্থা। দুর্গের মাথায় বুরুজ। বুরুজে বুরুজে বসানো আছে ছোট ছোট কামান। সৈনিকদের মধ্যে যারা অনিদ্রায় ভোগে, কেবল তারাই এই কামানগুলির পিছনে বসতে পায়।

রাজপ্রাসাদ থেকে এক ধাপ নীচে সেনানিবাস। সেখানে রয়েছে হাজার তিনেক সৈনিক। সেনানিবাসের গায়ে রসদ রাখবার জায়গা। এখানে বর্ষার আগে ঠেসে রসদ ভরা হয়। এমনভাবে ভরা হয়, যাতে মাস-আট দশ ধরে কোনও খাদ্যাভাব এখানে দেখা না যায়।

বিশালগড়ের পাহাড়ি প্রাসাদে এসে ভালই লাগল শাহজীর। মনে হল, তিনি ধরাতলের মলিনতা থেকে অনেক উঁচুতে আকাশের গায়ে এসে ঠাই নিয়েছেন। সকাল হলেই সূর্য এসে হানা দেন শয়ন কক্ষের গবাক্ষে। পাখির কাকলিতে ঘুম ভাঙে। দুপুরে শোনেন কোবাল্ট নীল আকাশে পাখসাট খাওয়া চিলের ডাক। নীচের দিক তাকালে টের পাওয়া যায় পাহাড়টি কতখানি উঁচু। রাশি রাশি গাছের সবুজ তরঙ্গের মতো নীচে নেমে গেছে। অনেক দূরে দূরে অনেক নীচে কয়েকটি লোকালয়ও চোখে পড়ে। ভাল করে চোখ রাখলে পিঁপড়ের মতো মানুষজনের চলাফেরাও চোখে পড়ে। একবার এইভাবে নজর রাখতে গিয়ে কয়েকজন অশ্বারোহীকে দেখে চমকে উঠেছিলেন শাহজী। রাজার খাস কর্মচারী নয়নচাঁদের ডাক পড়েছিল। বিশালগড় দুর্গে গত বিশ বছর ধরে আছে নয়নচাঁদ। এই গড়ের সকল অন্ধিসন্ধি তার জানা। মুঘলদের আক্রমণের সময় নয়নচাঁদ আক্রমণকারীদের ধোঁকা দিয়ে স্রেফ গাছের ডাল বেয়ে এবং পাথরের গা ধরে নীচে নেমে গিয়েছিল। নেমে গিয়ে আশ-পাশের লোকালয়ে গা ঢাকা দিয়ে বসেছিল। দেহাতিদের সঙ্গে নয়নচাঁদ সবজি বেচত আর নজর রাখত দুর্গের ভেতরে মানুষের গতিবিধির।

বিনম্র হাসি হেসে নয়ন বলল, 'ওরা সওদাগর। নগর থেকে সওদা নিয়ে এসেছে বসতের হাটে বেচবে।'

'অতজন কেন?'

'আজ্ঞে, ওঁরা দল বেঁধেই ঘোরা ফেরা করেন। পথে ডাকাতের ভয় আছে।'

এইভাবেই সময় কাটতে থাকল শাহজীর। প্রথম প্রথম এই নিরেট অবকাশ খারাপ লাগত না শাহর। নিজেকে ভারমুক্ত মনে হত তাঁর। রাত্তিরবেলা প্রাসাদ সংলগ্ন বিশাল চত্বরে বসে তারাভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বিশাল বিশ্বের রহস্য বুঝতে চেষ্টা করতেন। মাঝে মাঝে মনটা বড় নিঃসঙ্গ, উদাস হয়ে যেত। নিজের বুকের ভেতর থেকে প্রশ্ন জাগত 'আমি সত্যিই হিন্দুস্তানের জন্য কিছু করে যেতে পারব কি?'

রানি মহলে গেলে এই নিঃসঙ্গতা কেটে যেত। কিন্তু মাস দেড়েকের ভেতর এটাও হয়ে গেল একঘেয়ে। বৈচিত্র্যের লোভে এরপরে শাহজী শিকারে বের হতে আরম্ভ করলেন। নীচের জঙ্গলে নানা ধরনের জন্তু-জানোয়ারের বাস। নানা ধরনের বাঁদর, ভালুক, বুনো শুয়োর এবং হিংস্র নেকড়েই বেশি। তবে দু-একটি জায়গায় হরিণও দেখা যায়। শাহজী মাঝে মাঝেই হরিণ শিকার করে আনতে থাকলেন।

একদিন নীচে হঠাৎ কয়েকটি পালকি দেখে কৌতূহলী হলেন শাহজী।

নয়নচাঁদ ফের জানাল, 'ওই পালকিগুলি হল বাঈজীদের। এক নগর থেকে আরেক নগরে চলেছে বাঈজীদের দল। নগরের মেহমানরা এদের ডেকে নিয়ে গিয়ে নাচগানের মজলিশ বসায়। এরা সুখের পায়রা হুজুর! যেখানে সুখের আমদানি, সেখানেই এরা হাজির। শুনেছি দক্ষিণের এক শহরে এক শাহাজাদা এসেছেন, তেনার মনোরঞ্জনের জন্য অনেক বাঈজীর তলব হয়েছে।'

'শাহাজাদা এসেছেন? কী নাম তাঁর?'

'নাম-ধাম কিছুই বলতে পারব না হুজুর, তবে শুনেছি তিনি খুবই শৌখিন। প্রতি রাতেই তাঁর মজলিশ চাই। চাই নতুন বাঈজী!'

'বটে!' — গম্ভীর হয়ে গেলেন শাহুজী। কিছুক্ষণ গম্ভীর থেকে বললেন, 'নয়নচাঁদ, আমিও খুব শৌখিন লোক। নাচ দেখতে আমারও খুব ভাল লাগে। আমার জন্য বাঈজী জোগাড় করো। আমি এখানে প্রতি রাতে নাচের মজলিশ বসাব।'

নয়নচাঁদ হাসল, 'এ আর কী কঠিন কথা মহারাজ! আমি নীচের আস্তানায় খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি। আজ বিকেলেই সম্ভবত বাঈজী এসে যাবে।'

সেদিন অপরাহ্নে দু'জন বাঈজীকে ওপরের পাহাড়ি গড়ে তুলে আনা হল। কেবল বাঈজী এলেই হয় না। সঙ্গে এল বাদক দল। বাঈজীরা এল পালঙ্কে। বাদক দল ছোট ঘোড়ার পিঠে।

রাজা শম্ভুজীর আমলে প্রাসাদের লাগোয়া একটি নাচ মহল তৈরি হয়েছিল। এ মহলটি ঝাড়বাতি, গালিচা এবং নানা ধরনের শৌখিন আসবাবপত্রে সজ্জিত। কুড়ি-বাইশ বছরের অব্যবহারে তা আজ ধূলি-মলিন। কাচের ঝাড়বাতিতে ঝুল পড়েছে। গালিচায় জমেছে পুরু ধূলির আস্তরণ। দীর্ঘদিন ঘরের দরজা বন্ধ থাকায় ঘরটিতে সোঁদা গন্ধ।

রাতারাতি সাফাই করা গেল না নাচ মহল। সাফা করতে পুরো একটা দিন লেগে গেল। নাচের মজলিশ বসল পরের দিন সন্ধ্যায়। সেদিন ছিল পূর্ণিমা। দিনের আলো মেলাতে না মেলাতে আকাশের একদিকের অন্ধকার ভেদ করে উঠল সোনার থালার মতো চাঁদ। নাচ মহলের ভেতরে যেমন আলোর রোশনাই, বাইরেও তেমনি।

নাচ জমে উঠল। যত রাত বাড়ে, তত নাচ জমে। নাচ দেখতে গিয়ে ঝিম ঝিম করে উঠল শাহুজীর মাথা। লাস্যময়ী প্রধানা নর্তকীর দিকে তাকাতেই মনে হল অনেক দিন আগে এইরকম একখানি ঢলো ঢলো মুখ কোথায় যেন তিনি দেখেছেন। কোথায় দেখেছেন, তা চেষ্টা করেও স্মরণে আনতে পারলেন না। তবে বারবার তাকিয়ে দেখতে দেখতে মনে হল, এ মুখ তাঁর অতি পরিচিত। ভুরুর কাছে যে কাটা দাগ, ওই দাগটুকুও তাঁর পেটে আসছে, মনে আসছে না।

'আপনাকে আমি কখনও দেখেছি? আপনার মুখটা আমার বড়ই চেনা লাগছে। আপনার কপালের কাটা দাগটার ইতিহাসও যেন আমি এক সময় জানতাম। আমার স্মৃতিশক্তি বড় দুর্বল হয়ে গেছে দেখছি। আপনাকে জানতে বড় কৌতূহল .....' — এক নিঃশ্বাসে কথাগুলি বলতে বলতে হঠাৎ শাহুজী নড়েচড়ে বসলেন, 'বিবিজান আপনার নাম কি জুলেখা?'

'জি জনাব!' শাহুজীকে ছোট্ট একটি তসলিম জানালেন নাচনি বিবি। মৃদু হাসলেন। বললেন, 'এই বাঁদি কিন্তু আপনাকে দেখা মাত্রই চিনে ফেলেছে। তা চিনে ফেলেও নিজেকে প্রকাশ করতে পারেনি। প্রকাশ করার পরেও যদি আপনি আমাকে চিনতে না পারতেন, তা হলে সরমে লাগত।'

বাঈজী জুলেখার শেষ কথাগুলি শাহুজীর কানে পৌঁছল না। কারণ সেই মুহূর্তে শাহুজী চলে গেছেন তাঁর সেই মুঘল অবরোধের দিনগুলিতে। সাত বছর বয়সে তিনি ঢুকেছিলেন মুঘল অবরোধে। পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্ত থাকতে হয়েছিল বন্দি হয়ে। অবশ্য ছিলেন তিনি বাদশার খুব কাছাকাছি। তাই তিনি এমন অনেক ঘটনা ও চরিত্রকে কাছাকাছি দেখেছেন, যা সহজে ভোলা যায় না। জুলেখাকে তিনি দেখেছিলেন মুঘল প্রাসাদের এক সংলগ্ন উদ্যানে। বাদশা তখন রাজধানীতে ছিলেন না। ছিলেন দক্ষিণ দেশে। অথচ এই মেয়েটি সরাসরি বাদশার সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছে নিয়েই প্রাসাদে ঢুকেছিল। ঢুকেছিল একটা বিচার চাইতে। কিন্তু কে বিচার করবে? কে শুনবে তার ফরিয়াদ? বিচার চাইতে এসে বেচারা আটকে গেল মুঘল অবরোধে।

সে এক ঝলমলে সূর্যকরোজ্জ্বল সকাল। পাথুরে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে সংলগ্ন একটি উদ্যানে চলে এসেছিলেন শাহুজী। উদ্যানের গাছে গাছে তখন ফুলের মেলা। সকালের স্নিগ্ধ রোদ এসে পড়েছে নববিকশিত কুসুমের ওপর। ফুলে ফুলে অলি। লতাবিতানে ভ্রমরের গুঞ্জন। শাহুজীর মনটি বেশ প্রফুল্লই ছিল।

হঠাৎ ভেতর থেকে মৃদু কান্না শুনে থমকে দাঁড়ালেন যুবরাজ শাহু। কে কাঁদে? ফোঁপানো কান্না। কুঞ্জের ভেতর সোজা ঢুকে গেলেন শাহু। দেখলেন, দু'হাঁটুর ভেতর মুখ গুঁজে কেঁদে চলেছে একটি যুবতী মেয়ে। পোশাক এলোমেলো। কামিজে বিস্তর কোঁচ। পা-জামার তলার দিকটা অনেকখানি ছেঁড়া। কেশপাশ শিথিল।

'কে তুমি? কাঁদছই বা কেন? কী তোমার নাম?'

'আমার নামে তোমার কাজ কী খাঁ সাহেব। তোমার মতো মতলববাজদের আমি ঘেন্না করি।'

যুবরাজ শাহু হাঁ-হাঁ করে উঠলেন, 'আর যাই হই, আমি মতলববাজ নই বেগম সাহেবা। তা ছাড়া আমি খাঁ সাহেবও নই। আমি হলাম একজন বন্দি।

মারাঠা মুলুক হল আমার জন্মভূমি। আমার নাম শাহু।'

হিঁদু। তবে তো তোমার বন্দিদশা হতেই পারে। কিন্তু আমার লাঞ্ছনা করে তারা কোন সাহসে? আমি বিচার চাই।'

'কে লাঞ্ছনা করল? কী লাঞ্ছনা করল?'

'এক ইবলিসের বাচ্চা আমাকে বেসরম করেছে। বলতে বলতে মেয়েটি হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল। এরপর যতখানি সম্ভব সরম বাঁচিয়ে তার ছেঁড়া কামিজ আর ছেঁড়া পা-জামা দেখাল। দেখাল ভুরুর ওপরের একটি গভীর ক্ষত। বলল, 'এই দেখো নরপিশাচ কেমন করে আমাকে কামড়ে দিয়েছে। আমি এর বিচার চাই।'

'বিবিজান, আপনার এই দুঃখে সত্যিই সান্ত্বনা দেবার ভাষা নেই। যে এমন কাজ করেছে, তার এখনই শাস্তি হওয়া দরকার। কিন্তু আপনার নাম? শয়তানটাই বা কে?'

'আমার নাম? ধরুন জুলেখা।'

'ধরুন কেন?'

'হ্যাঁ, আমার নাম জুলেখাই। আর আমাকে যে পিশাচ বেসরম করেছে সে হল এক মুঘল শাহাজাদা।'

এবার শাহুজী হাসলেন। 'শাহাজাদারা নারীঘটিত কোনও অপরাধ করলে, তার কোনও বিচার হয় না জুলেখা। চাইলে, ওই নারীরা হারেমে ঠাঁই পেতে পারে। ব্যস্, ওই পর্যন্ত।'

'হারেমে আমি যাব না। আমি তার শাস্তি চাই। কঠোর শাস্তি।'

'সে শাস্তি তা হলে আপনাকেই দিতে হবে। কোনও বিচারক আপনার হয়ে এ কাজ করবেন না। বাদশাও না।'

মেয়েটি কী ভাবে শাহী মহলে ঢুকে পড়েছিল, তা জানতে চাননি শাহুজী। কেননা, এই ঢুকে পড়া ছিল রীতিমতো এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। চারিদিকে খোজা পাহারাদারেরা। এছাড়া হাবসি মেয়ে-পাহারাদারদের চোখ এড়িয়ে চলাও কঠিন। ওই সব কঠিন বেড়া টপকে কীভাবে জুলেখা ঢুকেছিল, কে জানে? মুঘল অবরোধে সে বেশ কিছুদিন ছিল। যতদিন ছিল, প্রায় ততদিন দেখা হত জুলেখার সঙ্গে। জুলেখা মাঝে মাঝে ছেলেমানুষের মতো কাঁদত। আর কাঁদতে কাঁদতে বলত, 'অপরাধীদের শাস্তি যদি কেউ না দেয়, আমিই দেব। আর আপনি যদি সেদিন মারাঠাদের রাজা হয়ে বসেন, আপনার রাজ্যে গিয়ে সে খবর আমি পৌঁছেও দিয়ে আসব।'

আজ বিশালগড়ের নাচ মহলে আলোকোজ্জ্বল ঝাড়বাতির নীচে বসে সব কথাই মনে পড়ে গেল শাহুজীর। জুলেখা তাহলে শেষ পর্যন্ত বাঈজীর পেশা নিল? শাহুজীর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠল। হায়, ঈশ্বরের কী বিধান? অনেকক্ষণ চুপ চাপ থাকবার পর জুলেখার মুখের দিকে তাকিয়ে

শাহ্ বললেন, 'জুলেখা, 'আপনাকে যে বেসরম করেছে, তার শাস্তি আপনি দিতে পেরেছেন?'

'না, আজও পারিনি। তবে পারতে হবে বলেই আমি এ পেশা নিয়েছি। আমার চোখের ওপর যে কামড়ে দিয়েছে, সুর্মাদানি দিয়ে আমি তার চোখ অন্ধ করে দেব।'

'যদি শাস্তি দিতে না পারো?'

'না পারলে যমুনার জলে ডুবে মরব।'

॥ চার ॥

রহস্য জটিলতর

সেই যে ঘুম ভাঙার আগে আস্তানা থেকে জোয়ান বখ্‌ত নেমে গেল নীচের জঙ্গলে, আর সে উঠে এল না। ছেলের প্রতীক্ষায় ইব্রাহিম খাঁ বসে রইলেন। চোখের সামনে গড়িয়ে গেল এক পক্ষ। জোয়ান বখ্‌ত নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। বুনো গাছের মতন সে মাথায় ডাগর হয়েছিল বটে, কিন্তু বুদ্ধির ঘরটা বেবাক ফাঁকা। তৈরি হয়নি কোনও দায়িত্ববোধ। জোয়ান বখ্‌ত নামেই সভ্য মুসলমান, কিন্তু কোনও শিক্ষা সহবত সে শেখেনি। গুটি কয়েক জংলি ছোঁড়ার সঙ্গে ঘুরে বেড়াত। মাওয়ালিদের মতো তার চলাফেরা। জঙ্গলের ভেতর একবার ঢুকে গেলে তার আর সময়ের হুঁশ থাকত না। বুড়ো বাপটার কথাও না। ফল-মূল আর ঝর্নার জল খেয়ে গোটা দিনটা কাটিয়ে দিত।

একটি একটি করে পনেরোটা দিন চলে গেল। কোনও খবর পাওয়া গেল না। ছেলেটা হারিয়ে গেল কি মারা গেল, তারও কিছুই বোঝা গেল না। শক্ত মানুষ ইব্রাহিম খাঁ টাল খেলেন। পাষাণে ফাটল ধরল।

যে মীর্জা আবদুলের হাত ধরে খাঁ সাহেব এসেছিলেন এই কোঙ্কন প্রদেশের আস্তানায়, সেই মীর্জা আবদুলের কুঠিতে একদিন হানা দিলেন ইব্রাহিম। মীর্জা আবদুল ব্যবসাদার। গঞ্জের ভেতর তাঁর আড়ত। ব্যবসায়িক সূত্রে সুদূর দিল্লি পর্যন্ত তাঁর গাতায়াত।

মীর্জা, আপনি আমাকে একটু সাহায্য করুন। আমার ছেলে জোয়ান বখ্‌ত আজ পনেরো দিন নিরুদ্দেশ। নিখোঁজ। যে ভাবেই হোক, তার খবর একটা আমাকে পেতেই হবে। তা সে জীবিত কি মৃত, সে খবরটুকু পেলেও চলবে।'

'তার পোশাক কেমন ছিল?'

'খেয়াল করিনি। তবে সে সর্বদাই সেজেগুজে থাকতে ভালবাসে। আমার অনুমান, সে ঝলমলে চটকদার পোশাক পরেই বেরিয়েছে।' ইব্রাহিম খাঁ বললেন, 'কিন্তু হঠাৎ পোশাকের কথা কেন? মীর্জা সাহেব, আপনি অন্য কিছু অনুমান করেন?'

মীর্জা আবদুল বিনীত ভঙ্গিতে বললেন, 'করি খাঁ সাহেব। আমাদের এই গঞ্জের বাইরে শাহী সড়কের ধারে বিরাট এক ছাউনি পড়েছে। ফতেনগর থেকে সৈয়দ হুসেন আলি খাঁ বিশাল এক ফৌজ নিয়ে চলেছেন দিল্লির দিকে। পাঁচ দশ ক্রোশ করে এগিয়ে চলেন আর বিশ্রামের জন্য ছাউনি ফেলেন। ছাউনি ফেলে পরিস্থিতির পর্যালোচনা করেন। কিছু কিছু লড়াকু ছেলেকে ঢুকিয়ে নেন দলে। রসদ জোগাড় করেন। তারপর আবার এগিয়ে চলেন। আমি ভাবছি হুসেন আলির দলে ছেলেটা ভিড়ে গেল না তো?'

ইব্রাহিম খাঁ নড়েচড়ে বসলেন, 'মীর্জা সাহেব, আপনি যে সৈয়দ হুসেন আলির কথা বলছেন, ইনি কি তাঁদেরই একজন, যাঁদের কাঁধে ভর দিয়ে ফারুক শিয়র তখ্তে বসেছেন?'

'জি। সৈয়দরা দুই ভাই। একজন হাসান। আরেক জন হুসেন। প্রথম জন দু'বছরের বড়। ওঁর যদি হয় ছেচল্লিশ, হুসেনের বয়স তা হলে চুয়াল্লিশ। দু'জনের চেহারা কিন্তু অনেকটা এক। বেঁটেখাটো মজবুত চেহারা। মাথাটা দু'জনেরই চেহারার তুলনায় বড়। দু'জনেরই মুখে চাপদাড়ি। কাঁচা-পাকায় মিশেল। দু'জনেরই নাকদুটি বাজপাখির ঠোটের মতো লম্বা আর বাঁকা। দৃষ্টি নেকড়ের মতো ধারালো। কখন কার ওপর যে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তার ঠিক নেই। যাই হোক, এঁদের কাঁধে ভর দিয়েই শাহাজাদা ফারুকশিয়র শাহী তখ্তে এসে বসেছিলেন। এঁদের একজনকে করেছিলেন 'কুতব-উল-মুলুক'। আরেকজনকে সেনাপতি। বিস্তর ধনদৌলতও দিয়েছেন। কিন্তু কিছুতেই এঁদের খিদে মিটছে না। এঁরা এখন বাদশাকে পুতুল বানিয়ে নিজেরা নিজেদের অধিকার কায়েম করতে চান।'

ইব্রাহিম খাঁ হাসলেন। দুঃখের ভেতরেও তাঁর হাসিতে একটুখানি তৃপ্তির ঝিলিক দেখা গেল। বললেন, 'পাপের ফল তা হলে ফলতে শুরু করেছে। আল্লাহ্ আছেন দেখতে পাচ্ছি। তা, হুসেন হঠাৎ দক্ষিণ দেশে কেন?'

'নিজের তখ্ত সুরক্ষিত করার জন্য ফারুক শিয়র ওঁকে দূরে ঠেলে রেখেছেন। এটি নিজেকে বাঁচাবার একটি কৌশল মাত্র। কিন্তু তা ধরে ফেলেছেন হুসেন খাঁ। দিল্লি থেকে বড় ভাই খবর পাঠিয়েছেন। শরীর খারাপের ছুতো করে হুসেন খাঁ বিশাল এক ফৌজ নিয়ে চলেছেন রাজধানী দিল্লিতে।

ওখানে গিয়ে এবার তখ্ত থেকে টেনে নামাবেন ফারুক শিয়রকে।'

'বটে!' খুশি হলেন ইব্রাহিম খাঁ, 'তা ফারুক শিয়রের পক্ষে আর কেউ নেই, যে সৈয়দদের পিটিয়ে তাড়িয়ে দিতে পারে রাজধানী থেকে? মুঘলদের দাপট কোথায় গেল? তাছাড়া মুঘলদের বন্ধু রাজপুতরা এখন কোথায়? তাঁরা এগিয়ে আসছেন না সাহায্য করতে?'

'তেনাদের হালও তেমনি সুবিধের নয় খাঁ সাহেব। যশোবন্ত সিংহের ছেলে অজিত সিং নিজের মেয়ের সঙ্গে বাদশা ফারুকের শাদি দিয়ে হিন্দুস্তানের দখলদারি চাইছে। এদিকে হাসান-হুসেনও টোপ দিয়েছেন অজিত সিং-কে। অজিত সিং কোন টোপটা গিলবেন, এখনও ঠিক করতে পারেননি।'

'আর মারাঠারা?'

'ঠিক বুঝতে পারছি না। চোট খেয়ে বেচারিরা অনেক দিন ঝিমিয়ে ছিল। ইদানীং শুনছি ভট্ট বালাজী নামে এক ধুরন্ধর পেশোয়ার কূটবুদ্ধিতে

মারাঠাদের শক্তি বৃদ্ধি হয়েছে। মুঘলদের এই গোলমালে রাজা শাহুজীই দাঁও মারতে পারেন।'

ইব্রাহিম খাঁ বিড়বিড় করতে লাগলেন, 'হিন্দুস্তানের বুকে এবার ঘোর অরাজকতা নেমে আসছে। এই পরিস্থিতিতে জোয়ান বখ্‌তের হারিয়ে যাওয়া কিছু বিচিত্র নয়। আমার আনারকলির মতো মেয়েদের দুর্দিন আরও বেশি আসছে। মীর্জা সাহেব, আপনার ব্যবসাপত্র কেমন চলছে?'

'ভাল নয়। দেশ এখন লুটেরাদের হাতে। এ অবস্থায় ব্যবসা চলে? আমাদের হাল খুবই খারাপ।'

'সবই আল্লাহের ইচ্ছা। আপনি একটু বড় করে ভাবতে শেখালেন, শুক্রিয়া। চলি।'

যে মানুষটি একটু আগে এসেছিলেন, এ মানুষটি যেন সে লোক নন। হন্‌হন্‌ করে চলে যাবার ধরন দেখেই বোঝা গেল, ইনি আরেক মানুষ হয়ে গেছেন।

আরও কিছুদিন গড়াল। অবশেষে হতাশ হয়ে খাঁ সাহেবের আস্তানায় মীর্জা আফদুল্লা তাঁর একজন কর্মচারীকে পাঠালেন। কর্মচারীর হাতে ধরিয়ে দিলেন ছোট্ট একটি চিরকুট। চিরকুটে লিখলেন, 'জনাব, আপনার ছেলের খোঁজে দিকে দিকে লোক পাঠিয়েছিলাম। তারা হতাশ হয়ে ফিরে এসেছে। হুজুরের ছেলের কোনও খবর তারা জোগাড় করতে পারল না। আমার ধারণা, কাছাকাছি কোনও মুলুকে থাকলে, নিশ্চয় তার আমরা তল্লাশ পেতাম। সে মুলুক ছেড়ে নির্ঘাৎ কোথাও চলে গেছে। আল্লাহ্‌ আপনার মনকে শান্ত করুন।'

মীর্জা সাহেবের চিঠি নিয়ে সকালবেলা পাহাড়ে উঠে গেল লোকটি। ফিরে এল দুপুর গড়িয়ে। এসে ধপাস্‌ করে বসে পড়ল।

'অমন করে বসে পড়লি কেন রে। খাঁ সাহেব কি খুব বকাঝকা করেছেন!'

'আজ্ঞে না। বকাঝকা করবার মানুষটাই নাই, তাই বকাঝকা করবে কে?'

'খাঁ সাহেব নেই?'

'না।'

'কী করে বুঝলি যে তিনি নেই? হয়তো ওপরের পাহাড়ে গেছেন, নয়ত নীচে?'

'না, তিনি কোথাও নাই। নীচের পাহাড়ের লোকেরাই তা আমাকে জানাল। তবে ওঁর আস্তানায় একটা চিঠি পেলাম। হুজুরকে লেখা।'

চিঠিটা টেনে নিয়ে পড়ল মীর্জা আবদুল্লা। 'আদাব মীর্জা সাহেব, আদাব। একদিন আপনার হাত ধরে এ মুলুকে এসেছিলাম, আজ আপনাকে না-জানিয়েই এ মুলুক ছেড়ে চললাম। এ সংসার আমার জন্য নয়। আল্লার ইচ্ছা নয় যে আমি এ সংসারে থাকি। গত তিনদিন ধরে গভীরভাবে চিন্তা

করবার পর স্থির করলাম যে আমি মক্কা চলে যাব। সেখানে কাবার অনতিদূরে একটি ঠাই জোগাড় করে নিয়ে বাকি জীবন কাটিয়ে দেবার ইচ্ছে। আমি ধর্মশাস্ত্র এবং বিচারশাস্ত্র পাঠ করে বুঝেছি, এ হিন্দুস্তানে এখন ধর্মও নেই, বিচারও নেই। মুলুক হিন্দুস্তান এখন একটি দোজখে পরিণত হয়েছে। তাই এই দোজখ পরিত্যাগ ছাড়া গতি দেখি না। পুনশ্চ : এ মুলুক ছেড়ে উপস্থিত আমি রাজধানী দিল্লি যাব। সেখানে কয়েকদিনের জন্য বেনিয়া রতনচাঁদের আশ্রয়ে থাকব। কিছু অর্থ সংগ্রহের পর মক্কা যাব। যদি আগ্রহী হন, তাহলে রতনচাঁদের কাছে আমার শেষ খবর পাবেন। ইতি— ইব্রাহিম খাঁ।'

চিঠিটি পড়ে আবদুল্লা মীর্জার মন খারাপ হয়ে গেল। কাহোকে কিছু না বলে চিঠিটি মুড়ে তাঁর জেবের ভেতর ঢুকিয়ে রাখল । মনে মনে ভাবলেন, যদি কখনও কোনও দিন ছেলেটির সঙ্গে দেখা হয়, তা হলে বাপের এই চিঠিটা তাকে ধরিয়ে দিতে হবে।

পাহাড়ের নীচে ছোট্ট একটি গঞ্জে যেদিন ছোট্ট এই নাটকীয় ঘটনাটি ঘটে গেল, সেদিন রাতে বিশালগড়ের দুর্গ প্রাসাদের ভেতর আরেকটি ঘটনা প্রত্যক্ষভাবে ঘটে গেল যা মারাঠা শক্তিকে রীতিমতো ঝাঁকিয়ে দিল।

একটু আগেই অপরাহ্ন বেলায় মহামন্ত্রী ভট্ট বালাজী এসে পৌঁছলেন পাহাড়ের শীর্ষে। সুদীর্ঘ খাড়াই পথ অশ্বের পিঠে চেপেই চলে এলেন বালাজী। সঙ্গে এল শ'আড়াই বাছাই ঘোড়সওয়ার। অস্ত্রধারী। শ'খানেক উট। উটের পিঠে দুর্গের রসদ। কয়েকটি হাতি। হাতির পিঠে সুসজ্জিত হাওদায় রাজ-পরিবারের কয়েকজন। ছেলে-বৌ। রাজকুমারীরাও।

মহামন্ত্রীর এই আগমনের খবর আগেই শাহুজীর কাছে এসে পৌঁছেছিল। শাহুজী অধীর আগ্রহে তাঁর প্রতীক্ষাতেই ছিলেন।

শাহুজী গত কয়েক বছর ধরে হিসেব করে দেখেছেন যে ভট্ট বালাজীকে মন্ত্রী নিয়োগ করে তিনি প্রভূত ফল পেয়েছেন। এই কয়েক বছরের ভেতরেই মারাঠাদের ভেতর বেশ খানিকটা ঐক্য এসেছে। মহরানি তারাবাঈয়ের সঙ্গে আপোস করার ফলে গৃহযুদ্ধ এড়ানো গেছে। মুঘলদের হাতে চলে যাওয়া দুর্গগুলি একে একে ফিরে এসেছে। সিতারা, পারলি, পানহানা, সিংহগড়, রায়গড়, রাজগড় এবং তোরনা দুর্গে মারাঠাদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ওদিকে মুঘলদের ভাঙনের চেহারা স্পষ্ট। তারা বিচ্ছিন্ন। এলোমেলো। মারাঠারা তাদের চিরাচরিত পদ্ধতিতে মুঘলশাসিত জনপদ থেকে লুঠ করে নিয়ে আসছে টাকা-পয়সা, ধনরত্ন। কিছুটা নিজেরা ভাগ বাঁটোয়ারা করে নিয়ে, বাকিটা জমা দিচ্ছে রাজকোষে।

এদিকে নিজেদের প্রত্যক্ষ শাসিত অঞ্চল থেকে রাজস্ব আদায়ও আছেই। বালাজী ভট্ট এই রাজস্ব সংগ্রহে খুবই কঠোর। এছাড়াও বাড়তি কিছু

আমদানি রয়েছে। তা হল 'চৌথ' আর 'সরদেশমুখী'। প্রথমটি পাওয়া যায় মুঘল অধিকৃত রাজ্য থেকে। রাজস্বের এক চতুর্থাংশ। দ্বিতীয়টি আদায় হয় লুঠ ও আক্রমণ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হবে বলে।

রাজকোষ স্ফীত হচ্ছে দিনে দিনে। রাজ্য সমৃদ্ধ হচ্ছে।

রাজ্য সমৃদ্ধ হলে রাজ্যের চেহারা বদল হয়। আর রাজ্যের চেহারা বদল হলে শাসকদের চেহারাতেও তার প্রতিফলন দেখা যায়। তাঁদের শরীরে চিক্কণ আভা ফুটে উঠতে দেখা যায়। দেখা যায় সুখী সুখী ভাব। গলার স্বর দরাজ হয়। মেজাজ শরিফ হয়। সূক্ষ্মশিল্পে অনুরাগ বাড়ে। মগজে নানারকম বুদ্ধিও খেলে। তা মারাঠা রাজ্যে শান্তি ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠার সঙ্গে রাজা শাহু এবং মহামন্ত্রী ভট্ট বালাজীর ভেতরেও এগুলি দেখা দিয়েছে। আগের তুলনায় বালাজী ভট্ট কিঞ্চিৎ প্রগল্‌ভ হয়েছেন। তাঁর সেই ধাতব কণ্ঠস্বর সঙ্কটের ও সমস্যার সময় ছাড়া শোনা যায় না। শোনা যায় তাঁর গলায় কখনও কখনও সুর লাগছে। ইদানীং নাকি তাঁকে মৃদু মৃদু হাসতেও দেখা যাচ্ছে।

রাজা শাহুরও মেলা পরিবর্তন হয়েছে। রোগা শুকনো চেহারা তাঁর আর নেই। চেহারায় রাজার আদল এসেছে। মুখে এসেছে গোলাপি আভা। গলায় এসেছে রাজকীয় দরাজ স্বর। বাঈজীদের নাচগান দেখে আবার দেখতে ইচ্ছা করে। পিয়াস মেটে না। তবে মাঝে মাঝে গভীর রাতে ঘুম ভেঙে যায়। মনে পড়ে যায়, মুঘলদের বন্দিশালার দিনগুলি। তাছাড়া মা, ঠাকুমা, বোনেরা যে এখনও মুঘল অবরোধে আটক হয়ে পড়ে আছেন। শাহু বেরিয়ে আসতে পেরেছেন, কিন্তু তাঁরা পারেননি।

আকাশে হালকা মেঘের মধ্যে এক ফালি চাঁদ আটকে রয়েছে। চারিদিকে জ্যোৎস্না আর জ্যোৎস্না। আলোর প্লাবনে ভেসে যাচ্ছে নীচের গাছপালাগুলি। রাত চরা পাখির ডাকও মাঝে মাঝে শোনা যায়। বুনো ফুলের গন্ধ তলা থেকে ধীরে ধীরে মৃদু বাতাসে ভেসে আসছে ওপরে। এ ফুলের গন্ধে কেমন যেন এক ব্যাকুলতা জেগে ওঠে বুকের ভেতর। সে রাতে বিশালগড়ের রাজ অট্টালিকার অলিন্দে পায়চারি করতে করতে মন খারাপ হয়ে গেল শাহুজীর। পরের দিন সকালে উঠেই তিনি নিজের মনের ব্যথা জানিয়ে চিঠি পাঠিয়ে দিলেন মহামন্ত্রীকে।

সেই চিঠি লেখার এক মাস পরে আজ দু'জনের মুখোমুখি দেখা। সন্ধ্যার কিছু পরে আট প্রধানের ভেতর তিন প্রধানকে নিয়ে মন্ত্রণাকক্ষে শাহুজী বসলেন রাজ্যের পরিস্থিতির আলোচনার জন্য। রাজার মুখোমুখি বসলেন এঁরা। মাঝে পেশোয়া বা প্রধানমন্ত্রী। বাঁ পাশে অমাত্য অর্থাৎ রাজস্ব মন্ত্রী। ডান পাশে বসলেন সামন্ত অর্থাৎ পররাষ্ট্র মন্ত্রী।

শাহুজী এঁদের ওপর এক ঝলক চোখ বুলিয়ে নেবার পর জিজ্ঞাসা

করলেন, 'সচিব কোথায়? সরকারি চিঠিপত্র পাঠাতে হলে তাঁকে যে আমাদের লাগবে।'

মহামন্ত্রী ভট্ট বালাজী বললেন, 'তিনি আগামীকাল প্রত্যুষেই এখানে এসে হাজির হবেন।'

'প্রত্যুষে?' চমকে উঠলেন রাজা, 'তার মানে তাঁকে এই দুর্গম পাহাড়ি পথ রাত্তিরে পার হয়ে আসতে হবে? এমন সিদ্ধান্ত তিনি নিলেন?'

'কারণ আছে মহারাজ। আমাদের সিতারা পাহাড়ি দুর্গের অদূরে মুঘল সেনাপতির ছাউনি পড়েছে। সেনাপতির নাম, সৈয়দ হুসেন আলি খাঁ। বাদশা ফারুক শিয়রের নির্ভরযোগ্য সেনাপতি। তাঁর কাছে একটি চিঠি পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করে তবে তিনি আসবেন।'

'কোন চিঠি?'

'আমরা রাজপরিবারের সকলের মুক্তি চাই। মুঘল বন্দিশালায় রাজমাতা ও রাজবধূদের দীর্ঘদিন আটক করে রাখার অর্থই হল চরম শত্রুতা। বাদশা ফারুক যদি সে শত্রুতা চান, তাহলে মারাঠা সৈনিকরা অনুরূপ কোনও কাজ করে তার জবাব দেবে।'

'বাঃ, সাচ্চা কথা বলেছেন ভট্টজী! মারাঠাবা এখন আর দুর্বল নয়।' শাহুজী খুশির হাসি হাসলেন, 'তা আজ আর কী কী বিষয়ে পরামর্শ করতে চান ভট্টজী? আপনার কোনও সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব আছে?'

'আছে। সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবই আছে।' মহামন্ত্রীর গলায় আবার সেই ধাতব স্বরটি শোনা গেল। 'মহারাজের মনে আছে নিশ্চয়, তিনি এই দুর্গে বসে এই রকম এক রাতে একটি প্রস্তাব এনেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, মুঘলদের ভেতর যখন ভাঙাভাঙি আরম্ভ হয়ে গেছে, তখন আমরা স্রেফ হাত গুটিয়ে বসে থাকব? এ চমৎকার সুযোগ নেব না?' সেই রাতে মহারাজের এমন একটি সুন্দর প্রস্তাবের কোনও জবাব আমি দিতে পারিনি। আমি থম্ মেরে বসেছিলাম। এমন ভাব করেছিলাম, যেন আমি শুনতেই পাইনি। মহারাজ! সেদিনের অসৌজন্যের জন্য আমি আজ ক্ষমাপ্রার্থী। আসলে সৈন্যবাহিনী ও টাকা পয়সার অপ্রতুলতার জন্যই কোনও পরিকল্পনা সেদিন আমার মাথায় আসেনি। তাছাড়া আমাদের গুপ্তচর বাহিনীও সেদিন তৈরি ছিল না। আজ সব দিক থেকে আমরা তৈরি। আমরা এখন থেকে মুঘলদের সঙ্গে টক্কর দেব। মহারাজ আমাদের অনুমতি করুন।'

শাহুজীর মারাঠা রক্ত চঞ্চল হল। তিনি অমাত্যের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'রাজস্বের কোনও ঘাটতি নেই তো! যুদ্ধের ঝুঁকি নেওয়া যাবে?'

'যাবে।'

শাহু এবার তাকালেন পররাষ্টরমন্ত্রীর দিকে। জিজ্ঞাসা করলেন, 'সামন্তজি, আমাদের প্রতিবেশী রাজ্যগুলির অবস্থা কেমন?'

সামন্ত বললেন, 'বিজাপুর আর গোলকুণ্ডার অরস্থা খুবই খারাপ। আমাদের সঙ্গে লড়বার ক্ষমতা তাদের নেই। মুঘল সুবাদাররা নিজের নিজের আখের গুছোতে ব্যস্ত। সৈয়দ হুসেন খাঁ চলেছেন বাদশা ফারুককে খবর করতে। চারিদিকে এলোমেলো অবস্থা। এই অবস্থায় আমরা যদি 'ধাক্কা' দিই, তা হলে মুঘলদের হাল খুবই খারাপ হবে। আমরা অনায়াসেই রাজ্য বাড়িয়ে নিতে পারব।'

খুশি চেপে শাহুজী বললেন, 'ভট্ট বালাজী, এবার আপনি বলুন।'

'মহারাজ! দিল্লির বাদশার কাছে আমরা একটি দাবি-সনদ পাঠিয়ে দিতে চাই। বেশি নয়, আমাদের এই সনদে থাকবে গুটি তিন চার দাবি। এর ভেতর পয়লা দাবি থাকবে রাজ পরিবারের মুক্তি। দ্বিতীয় থাকবে স্ব-রাজ। অধীনতামূলক মিত্রতা নয়। হিন্দুস্তানের বুকে বহিরাগত মুঘলদের স্বাধীন রাজ্য যদি থাকতে পারে, তাহলে মারাঠাদেরও নিজের রাজ্য থাকবে না কেন?' শাহী কোষে খাজনা জমা দিয়ে আমরা মিত্রতা কিনতে চাই না।'

'সাচ্চা প্রস্তাব। সাধু সাধু!' শাহুজী উল্লসিত হলেন।

'আমাদের তৃতীয় প্রস্তাবটি থাকবে রাজস্ব সংগ্রহ নিয়ে। 'চৌথ' আদায় আর 'সরদেশমুখী' সংগ্রহকে মুঘলদের আইনত মেনে নিতে হবে। অর্থাৎ হানাদারি করে নয়, প্রকাশ্যে চৌকি বসিয়ে এ রাজস্ব সংগৃহীত হবে।'

'উত্তম প্রস্তাব।' রাজা শাহু সমর্থন করলেন। তারপর মাথা চুলকে বললেন, 'আমাদের প্রস্তাবিত দাবি-সনদ যদি দিল্লির বাদশা না মেনে নেন? তখন আমরা কী করব? সরাসরি লড়াইয়ে নামব?'

ভট্ট বালজী চট করে জবাব দিলেন না। এ বিষয়ে তিনি যা যা ভেবেছেন, সেই সুচিন্তিত মতামতটি পেশ করার আগে সম্ভবত মনে মনে একটু মহড়া দিয়ে নিতে চাইলেন। তাই কিছুক্ষণের জন্য তাঁর তুষ্ণীভাব। মন্ত্রণা-সভা নিস্তব্ধ। চেরাগের গায়ে গায়ে একটি পতঙ্গ শব্দ করে ঘুরতে লাগল। তার সেই বোঁ-বোঁ শব্দ ছাড়া কক্ষে আর কোনও শব্দ নেই।

হঠাৎ ছন্দপতন ঘটল। নৈশ স্তব্ধতাকে ভেঙে বাইরের থেকে একটি কোলাহল মন্ত্রণা-সভার ভেতরে এসে ঢুকে পড়ল। ভট্ট বালাজীর ভ্রু-যুগল কুঞ্চিত হল। রাজার বদলে তিনিই বলে উঠলেন, 'কোটাল, তুমি এখানে আছ?'

'জি'।

'বাইরে কিসের গোলমাল? কারা গোলমাল করছে? সক্কলকে এখানে ডেকে নিয়ে এসো! বিচার হবে।'

'জি'।

মহামন্ত্রীর আদেশে বাইরে বেরিয়ে গেলেন কোটাল। কোটাল যাবার পর বাইরের গোলমাল কিঞ্চিৎ কমল বটে কিন্তু একটি অপরিচিত গলা চিৎকার

করে কিসের জন্য যেন আর্জি জানাতে থাকল। মাঝে মাঝে দরজার কাছে মশালের আলোর ঝিলিক দেখা গেল। এদিকে ঘরের ভেতর সেই একই রকম স্বব্ধতা। তবে গোলমালের বিষয়টি জানবার জন্য সকলেই উৎকর্ণ। মহামন্ত্রীর মুখমণ্ডলে বিরক্তির ছাপ। শাহজী সন্ত্রস্ত, উত্তেজিত।

আরও খানিক অপেক্ষায় কালক্ষেপ। শেষে দু'জন মশালধারী সহ জনাচারেক সৈনিক টানতে টানতে এক যুবককে সভাকক্ষে নিয়ে এল। পিছনে দুর্গের কোটাল।

'কে এই ছোকরা? তোমরা একে টানাটানি করছ কেন?'

একজন সৈনিক নমস্কার জানিয়ে বলল, 'ইনি একজন মুঘল শাহাজাদা। গা-ঢাকা দিয়ে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। পরে সৈয়দ হুসেন খাঁর ছাউনির কাছ থেকে আমরা এঁকে পাকড়াও করে নিয়ে এসেছি। অনেক অনুরোধ করা সত্ত্বেও ইনি নিজের পরিচয় কবুল করতে চাইছেন না।'

শাহজী তাঁর সন্ধানী চোখ দিয়ে বার কয়েক পরখ করে দেখে বললেন, 'তা চেহারাখানা তো শাহাজাদাদেরই মতন।'

মহামন্ত্রীও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিলেন ওই নবাগত তরুণ যুবককে। এবার বললেন, 'যুবক, তুমি এই মুলুকের জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন? থাকো কোথায়?'

যুবকটি বিনীতভাবে বলল, 'আমি নীচের পাহাড়ে থাকি। আমি আর আব্বাজান। অনেকদিন ধরে আছি। খুব ছোটবেলা থেকে। আমার মা নেই।'

'আগে কোথায় ছিলে?'

'আজ্ঞে দিল্লিতে। তবে দিল্লির কথা আমার তেমন মনে পড়ে না।'

'তোমার নাম কী?'

'আজ্ঞে আমার নাম জওয়ান বখ্‌ত।'

'তুমি বুলান্দ আখতারকে চেনো?'

'জি না, এ নামে কারোকে আমি চিনি না।'

'তোমার কি কোনও বোন ছিল? তার নাম কি সফি-উন্নেসা?'

'আমার এক বোন ছিল বটে, কিন্তু তার নাম সফি-উন্নেসা নয়। তার নাম ছিল, আনারকলি।'

'হুম্‌। গম্ভীর হয়ে গেলেন মহামন্ত্রী ভট্ট বালাজী। কোটালের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই যুবক অবশ্যই একজন সন্দেহজনক ব্যক্তি। এখন একে আটক করে রাখো। কাল প্রত্যূষে এর একটা ব্যবস্থা করা যাবে।' ছেলেটিকে টানতে টানতে কোটাল সহ দু'জন সৈনিক চলে গেল। যে সৈনিকটি একে 'শাহাজাদা' বলে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল তার দিকে তাকিয়ে ভট্ট বালাজী বললেন, 'ওই যুবক যে পাহাড়ি আস্তানার কথা বলল, তোমরা কি সে আস্তানায় গিয়েছিলে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমরা সেখানে গিয়েছিলাম। কিন্তু আমরা ওর বাপের দেখাই পাইনি। আমরা সেদিন দুপুরে ওর বাপের আস্তানায় গিয়ে হানা দিলাম, সেদিন সকালেই উনি আস্তানা ছেড়ে কোনও অজানা মুলুকে চলে গেছেন। কোথায় গেছেন, তা অনেক চেষ্টা করেও জানতে পারিনি।' তদন্ত করে জানলাম, উনি একা একা থাকতেন। কারো সঙ্গে মেলামেশা করতেন না। নীচের গঞ্জে মুসলমানদের মাজারে মাঝে মাঝে যেতেন। কাজী হিসাবে দোষীদের বিচার করতেন। বিনিময়ে কিছু মাসোহারা পেতেন।'

'আর কিছু'?

'আজ্ঞে না।'

সৈনিকটিকে বিদায় দিয়ে বেশ খানিক গুম্ মেরে বসে রইলেন মহামন্ত্রী। চোখ দুটি বোজা। বোঝাই গেল, তিনি সুদূর অতীতের কোনও কথা, কোনও স্মৃতি মনের ভেতর টেনে আনতে চাইছেন। কিংবা কোনও নতুন মতলব তাঁর মনে হানা দিয়েছে, এখন তিনি তারই বিশেষ আকার দিতে ব্যস্ত। চারদিক শুনশান। মন্ত্রণাকক্ষের দেওয়ালে দীর্ঘ ছায়া কাঁপছে। শাহুজীও ভাবছেন, কে এই শাহাজাদা? আর সত্যিকারের শাহাজাদাই যদি হবেন, তিনি দিল্লি ছেড়ে এখানে আসবেন কেন?

'মহারাজ! ওই যুবককে আমি শনাক্ত করতে পেরেছি। উনি সত্যি সত্যিই এক মুঘল যুবরাজ। আপনারা যাকে 'শাহাজাদা' বলেন, তাই।'

'শাহাজাদা! কার ছেলে?'

'বাদশা ঔরংজেবের চতুর্থ পুত্র শাহাজাদা আকবরের কথা আপনার মনে আছে? দক্ষিণ দেশে থাকবার সময় বাদশা ঔরংজেবের ছাউনি থেকে উনি সপরিবারে পালিয়ে এসেছিলেন রাঠোর রাজপুতদের শিবিরে। সে ইতিহাস আপনাদের মনে আছে? বাপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন আকবর। রাতের অন্ধকারে হঠাৎ হানা দিয়ে বন্দি করতে চেয়েছিলেন নিজের বাপকে। তাঁর কোনও চেষ্টাই অবশ্য সফল হয়নি। শেষের দিকে তিনি শম্ভুজীর আশ্রয়ও নিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর কোনও উদ্যোগই যখন সফল হল না, তখন বাপের হাত থেকে বাঁচবার জন্য পালিয়ে গেলেন জাহাজে করে পারস্যে। নিজের ছেলেপুলেদের এবং বেগমদের নিয়ে পালাতে পারেননি। তাদের ফেলে রেখে চলে যান। বেগম সাহেবা নাকি তাঁর তিন মেয়ে এবং দুই ছেলেকে নিয়ে বাদশার আশ্রয় পেয়েছিলেন। বাকি ছেলে মেয়েরা সব ছিটকে গিয়েছিল। বুলান্দ্ আখতার নামে একটি ছেলে এবং সফি-উন্নেসা নামে ছিটকে যাওয়া একটি মেয়ে দুর্গাদাস রাঠোরের কাছে মানুষ হয়েছিল। তারাও শেষমেশ বাদশার কাছে পৌঁছে যায়। শুনেছি, ওই শাহাজাদা আকবরের আরও একটি ছেলে ছিল। সে নাকি আজও জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়। মনে হয় 'জওয়ান বখ্‌ত' নামের এই ছেলেটি শাহাজাদা আকবরের

সেই হারানো ছেলে।'

'সত্যি?'

'সত্যি না হলে সৈনিকরা 'শাহাজাদা নামটি কোথায় পেল? আর এই শাহাজাদা ধরা পড়বার সঙ্গে সঙ্গে নকল বাপটা অমন ভাবে হাওয়া হয়ে গেল কেন?'

'তা ঠিক। এখন এই শাহাজাদাকে নিয়ে আমরা কী করব? কোথায় রাখব? আমাদের কাছে এই যুবকটি একটি দায় হয়ে গেল না কি?'

'দায়? দায় কেন? এই শাহাজাদাকে আমরা মুঘল সিংহাসনের দাবিদার বলে ঘোষণা করতে পারি। সৈয়দদের দুই ভাই যদি ফারুককে তখ্‌তে বসিয়ে নিজেদের কাজ হাসিল করতে পারে, তাহলে আমরাও এই শাহাজাদাকে ঘুঁটি করে দিল্লির তখ্‌তের দিকে এগোতে পারি।'

একনাগাড়ে কথা বলে এবার মহামন্ত্রী ভট্ট বালজী মৃদু হাসলেন। মেঘলা আকাশে ক্ষীণ বিদ্যুৎদীপ্তির মতো। এরপর ধাতব কণ্ঠস্বরে শোনা গেল, 'মহারাজ। একটু আগেই আমরা দাবি-সনদের কথা আলোচনা করছিলাম না! ওই সনদে তিনটি দাবির কথা বলছিলাম, এবার চতুর্থ দাবিটিও লিপিবদ্ধ করা হোক। আমাদের চতুর্থ দাবি হবে, শাহাজাদা জওয়ান বখ্‌তকে তাঁর উপযুক্ত মর্যাদা দিয়ে দিল্লির শাহী প্রাসাদে ঠাঁই করে দিতে হবে। এনার দায়-দায়িত্ব আমরা আর বহন করব না।'

'যদি বাদশা ফারুক শিয়র এ দাবি না মানেন? শাহাজাদাকে শাহী প্রাসাদে ঢুকতে না দেন?'

'শাহাজাদার দাবি যদি নস্যাৎ করা হয়, তা হলে তার দায়িত্ব বাদশাই নেবেন। আর এর মোকাবিলা আমরা করব না, করবেন সৈয়দ ভ্রাতা হুসেন আলি খাঁ।'

পাঁচ

সৈয়দ হুসেন খাঁ

পাহাড়ের কোণ দিয়ে দুর্গত অরণ্যকে ভেদ করে শাহী সড়কটি চলে গেছে উত্তরের দেশে।

এ পথ ইতিহাসের বহু ঘটনার সাক্ষী। হাজার হাজার সৈনিকের ঘোড়ার খুরের শব্দে এ পথ মাঝে মাঝেই হয়ে উঠেছে মুখরিত। বহু অস্ত্রের ঝনঝনি শুনেছে এই সড়ক। তবে বেশির ভাগ সময়েই এ পথ থাকে ঘুমিয়ে। নির্জীব অজগরের মতো চুপচাপ হয়ে থাকে। পাহাড়ের নির্জনতা এবং অরণ্যের নিঃসঙ্গতা একে রাখে ঘুম পাড়িয়ে। কয়েকদিন আগেও এ পথ ঘুমিয়েই ছিল। এখন শয়ে শয়ে লোক আসছে এই পথ ধরে।

শাহী সড়কটির পাশে বিশাল এক ছাউনি পড়েছে।

ছাউনি তো নয়, রাতারাতি আলাদীনের প্রদীপের ছোঁয়ায় গজিয়ে উঠেছে একটি নগরী। বিরাট একটি এলাকা প্রাকারে ঘিরে ফেলা হয়েছে। প্রাকারের পরেই সেনা নিবাস। অশ্বশালা। পিলখানা। অস্ত্রাগার। এরপরেই রয়েছে চাকরদের আস্তানা। সে আস্তানায় চামার, কামার, কুমোর ভিস্তিওয়ালা, মেথর, মজুর, ফরাস ইত্যাদি সকলের থাকবার ব্যবস্থা আছে।

মূল শিবিরে চৌষট্টিটি কক্ষ। কক্ষে কক্ষে মহার্ঘ গালিচা বিছানো। কিংখাব আর মখমলের সাজে কক্ষগুলি ঝলমল করছে। রেশমি কাপড়ের বর্ণাঢ্য সমারোহে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। এঁদের কক্ষগুলিতে সুবর্ণপালঙ্ক এবং সুচিক্কণ ফিরিঙ্গি দর্পণ আরও শোভা বাড়িয়ে দিয়েছে। বেগমদের সেবায় বাঁদীরা নিরন্তর ব্যস্ত। সোনার কাঁকুই দিয়ে চুলের জট ছাড়িয়ে গন্ধ তেল দিয়ে পরে তাকে বিন্যস্ত করতে হচ্ছে। আতরের গন্ধে চারদিক মম। কোনও কোনও বাঁদী গোসলখানার ভেতর বেগম সাহেবাকে উদম করে স্নিগ্ধ জলে গা মেজে দিচ্ছেন। কোথাও মৃদু গলায় মিঠা সঙ্গীত।

চলমান এই বিরাট নগরীকে বহন করে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রচুর খরচ লাগে। লাগে প্রভূত লোকবল এবং মেহনত। আবুল ফজল তাঁর আইন-ই-আকবরীতে যে হিসেব দিয়েছেন, সেই হিসেব এখনও চলছে। একশ হাতি, পাঁচশ উট, চারশ গো-সকট এবং এক হাজার মুটে আজও লাগে। এসব সম্পত্তি রক্ষা করার জন্য পাঁচশ ঘোড়সওয়ার অষ্টপ্রহর দরকার। সেই পাঁচশ অশ্বারোহী পাহারাদার আজও লাগছে। তাঁবু খাটাতে এবং কক্ষগুলিকে রসবাসের উপযোগী করে তোলা সাধারণ মানুষের কাজ নয়, তারজন্য পারস্য দেশের এবং তুরাণদেশের দক্ষ কারিগর দরকার। সে কারিগরেরা আজও হাজির। এ ছাড়া যারা হাজির রয়েছে, তারা হল এক হাজার ফরাস, পাঁচশ মজুর, একশ ভিস্তি, পঞ্চাশজন ছুতার মিস্ত্রি, পঞ্চাশজন তাঁবুওয়ালা, একশজন দরজি, পঞ্চাশজন কড়াওয়ালা, তিরিশ জন চামার,

কুড়িজন কামার এবং শ-দুই মেথর।

নিজের খাস কক্ষে বসে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খাঁ হুসেন আলি তাঁর সেরেস্তাদার মিশির খানের কাছে এইসব বিষয়ে হিসেব নিচ্ছিলেন। মিশির খান ইলাহাবাদের মানুষ। ইলাহাবাদে থাকবার সময় থেকেই মিশিরলাল খাঁ সাহেবের অনুগত সেরেস্তাদার। হিসাব রাখার ব্যাপারে খুবই দক্ষ।

মিশির খানের দিকে তাকিয়ে হুসেন খাঁ বললেন, 'আমাদের সেনাদের রসদ ব্যবস্থা ঠিক আছে তো?'

'তা আছে।'

'এই মুহূর্তে আমাদের সেনানিবাসে কত সৈনিক আছে?'

মাথা চুলকিয়ে মিশির জি বললেন, 'তা আজ্ঞে, আট নয় হাজার হবে। অবশ্যি গোলন্দাজ সেনা বাদ দিয়ে। গোলন্দাজদের ধরলে আরও বেশি।'

'ভিল আর তেলিঙ্গি সেনাও কি এর ভেতর রয়েছে?'

'আজ্ঞে না।'

'তাদের সংখ্যা কত?'

'হাজার তিন।'

হুসেন খাঁ কুরশিতে গা এলিয়ে দিয়ে ভ্রূযুগল ঈষৎ কুঞ্চিত করে বললেন, 'নানাজী, এর সঙ্গে বারো হাজার মারাঠা সৈন্য যদি যোগ হয়, তাহলে আমাদের রসদ যোগানোর কি খুব অসুবিধে হবে? আমাদের কাছে পুঁজি কেমন আছে?'

নানাজী স্বগতোক্তির ভঙ্গিতে বললেন, 'বারো হাজার' সে তো মেলা সৈনিক। হুজুর দিল্লিতে গিয়ে লড়াই করবেন না কি?'

'যদি করি?' হাহা করে হেসে উঠলেন খাঁ সাহেব। 'লড়াই করার জন্য আরও অস্ত্র কিনতে হবে, বারুদ-বন্দুকও চাই। হয়তো হাজার তিনেক ঘোড়ারও দরকার হতে পারে। নানাজী, এসব টাকার যোগান আছে তো?'

'আজ্ঞে, সে তো বিস্তর খরচ?'

'তা বাদশার মতো চলা-ফেরা করতে হলে খরচ হবে বই কী?'

এইভাবে আরও কিছুক্ষণ হয়তো কথা চালাচালি হত, কিন্তু আগে বেগম মহলের তাঁবু থেকে ভেসে আসা এক কলি গান খাঁ সাহেবকে উন্মন করে তুলল। খাঁ সাহেব উৎকর্ণ হয়ে খানিকটা গান শোনবার পর বললেন, 'নানাজী, বেগম সাহেবার তাঁবুতে এ গান কে গায়? অপরিচিত গলা।'

'বেগম মহল্লায় এক নাচনি বিবি এসেছে হুজুর। সঙ্গে একটি মেয়ে।'

হুসেন আলি খাঁ গুনের সমঝদার। তিনি নাচ-গান এবং বিবিদের সঙ্গে হই-হুল্লোড় ভারি পছন্দ করেন। তাঁর এই দিল্লি যাত্রার পথ নিরামিষ পথ নয়। এই পথ নির্জলাও নয়। মাঝে মাঝেই তিনি নাচ-গানের মজলিশ বসান।

মজলিশে বসে শরাবে গলা ভেজান। ঔরঙ্গাবাদ থেকে তিনি এক ঝাঁক বিবিও নিয়ে এসেছেন। তাঁর এই সুদীর্ঘ যাত্রা পথ যাতে একঘেয়ে না মনে হয়। এছাড়া তাঁর মনের ভেতর সর্বদাই একটা শঙ্কা আছে। এই শঙ্কা হল মৃত্যুর। যে-ভাবে তিনি বাদশার সঙ্গে চরম কলহে লিপ্ত হচ্ছেন, তাতে তাঁর জয়লাভের সম্ভাবনা যেমন প্রবল, তেমনি পরাজয়ের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। হয় শাহী তখ্‌ত, নতুবা কফিন।

বাপ আবদুল্লা খাঁ ওরফে সৈয়দ মিয়াঁ অবশ্য নিছক সৈনিক ছিলেন না। বাদশা আলমগীরের মীর বক্‌শি রুহুল্লা খাঁয়ের স্নেহলাভ করে তিনি ছোট্ট একটি মনসব পান। সেই থেকেই এঁদের খানিকটা কপাল খুলল। সৈয়দ মিঞার মেলা ছেলে। সেই অগুনতি ছেলেদের মধ্যে বেঁচে রইল কেবল হাসান আর হুসেন। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পরে শাহাজাদাদের হাত ধরে এঁরা একটু একটু করে উঠে এলেন ক্ষমতার বৃত্তে।

হাসান আলি খাঁ ওরফে আবদুল্লা খাঁ নতুন বাদশার সঙ্গে গোপনে চিঠি চালাচালি করে একটি পথ খুঁজে বার করতে চাইছেন। আর হুসেন আলি লড়াই করতে বেরিয়ে পড়েছেন দু র্গ রোটাস গকড়কে পুণরুদ্ধারের কাজে।

এই সময় একটি অঘটন ঘটল।

সন্ধ্যার কিছু পরে কুঠির সামনে হঠাৎ একটি তাঞ্জাম এসে থামল। পাতলা ও সূক্ষ্ম মসলিন দিয়ে তাঞ্জামটি ঢাকা।

অভিজাত ঘরের এক রমণী বেরিয়ে এলেন সেই সুসজ্জিত তাঞ্জাম থেকে। রমণী সুন্দরী। মহার্ঘ পরিচ্ছদে সুসজ্জিত। তবে চোখে মুখে উদ্বেগ। কেশপাশ আলুথালু। আলুথালু কেশে দু-চারটি রুপোলি রেখা। সঙ্গে একটি কিশোরী মেয়ে। মেয়েটিও ভারি ফুট ফুটে দেখতে।

সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এলেন রমণী। সঙ্গে সেই মেয়েটি। এদিকে খাঁ সাহেবদের জননী অন্দরের ঝরোখা থেকে এক ঝলক দেখেই চিনে ফেলেছেন রমণীকে। তিনিও বেরিয়ে এলেন উর্ধ্বশ্বাসে।

'কী আমাকে চিনতে পারছেন? না কি পরিচয় ভেঙে বলতে হবে?' সুন্দরী মধ্য যৌবনা রমণী প্রশ্ন করলেন।

বলেন কী? আপনি হলেন শাহাজাদা আজিম উশ্‌শাহের বেগম। ফারুক শিয়রের জননী। আপনার স্বামীর অনুগ্রহ পেয়েই তো আমার ছেলেরা তাদের মর্যাদা পেয়েছে। আপনাকে আমাদের বংশের কে না চেনে?'

'স্বস্তি বোধ করলাম, বহিন!' কক্ষের পালঙ্কে থপ করে বসে পড়লেন ফারুক শিয়রের জননী। মেয়েটিও পাশে বসল। 'আমার সঙ্গে এই মেয়েটিকে দেখছেন, এ মেয়েটি হল আমার নাতনী। শাহাজাদা ফারুকের মেয়ে।'

'আমার কী সৌভাগ্য! আপনার পায়ের ধুলো পড়ে আমাদের কুঠি পবিত্র হল।'

'বেগম সাহেবা হাসলেন, 'আমি এসেছি আপনার ছেলেদের কাছে একটা সাহায্যের প্রার্থনা নিয়ে। কুঠি পবিত্র করতে নয়। সেই প্রার্থনা যদি মঞ্জুর হয়, তাহলে খুশি হব, নইলে মরণ ছাড়া আমাদের আর কোনও পথ নেই। ফারুকের বাপ্ মরেছে, কাকারা মরেছে। দুই ভাইও মরেছে। এখন বাকি আছে ফারুক। এই ফারুকের না-আছে লোকবল, না ধন বল। আপনারা যদি এখন তাঁকে সাহায্য না করেন তাহলে তাকেও মরতে হবে।'

'মরতে হবে কেন?'

'কেন?' শেষ কথাটি প্রতিধ্বনি করে বেগম সাহেবা বললেন, 'মরতে হবে দিল্লির তখ্‌ত দখলের দাবিদার হওয়ার জন্য।'

'শাহাজাদা যদি তখ্‌ত না চান?'

'না-চেয়ে চুপচাপ বসে থাকা কোনও শাহাজাদার পক্ষে সম্ভব নয়, বহিন!'

'ওরা যদি সাহায্য করতে রাজি না হয়? খাঁ সাহেবদের মা ঢোঁক গিলে বললেন, 'যদি আর কোনও শাহাজাদাকে কথা দিয়ে থাকে?'

'অসম্ভব। এমন ভয়ঙ্কর কথা আমি কিছুতেই মেনে নেব না। কিছুতেই না।' বলতে বলতে বিধবা বেগম সাহেবা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। দিদার কান্না দেখে কিশোরী মেয়েটিও কাঁদতে আরম্ভ করল। সৈয়দদের কুঠিতে সেদিন কেউই ছিল না। না হাসান। না হুসেন। অনেক কষ্টে বেগম সাহেবাকে আশ্বস্ত করা হল। —বেগম সাহেবা শেষে কুঠি ছাড়বার আগে বলে গেলেন, 'সৈয়দ ভাইয়েরা যদি ফারুককে সাহায্য করতে রাজি না হয়, তাহলে তারা যেন শাহাজাদা ফারুককে লোহার শেকলে বেঁধে পৌঁছে দিয়ে আসে জাহান্দার শাহের কাছে।'

শেষ পর্যন্ত সৈয়দ ভাইরা অবশ্য ফারুককে সাহায্যে রাজী হল। ফারুকশিয়র সৈয়দ ভাইদের দু'হাত জড়িয়ে ধরে বলল, 'তখ্‌ত যদি পাই, তাহলে তোমাদের উপযুক্ত বক্‌শিস আমি দেব। তোমরাই হবে আমার উজির-ই-আজম ও মীর বক্‌শি। তোমাদের সঙ্গে শলা-পরামর্শ করেই আমি হিন্দুস্তান শাসন করব।'

এরপরে হয়েছিল জান কবুল করে লড়াই। শেষে শাহাজাদা ফারুক বাদশাহ হলেন। উৎসবে আনন্দে গড়িয়ে গেল একটি বছর। বাইরের শত্রু নিশ্চিহ্ন হল। শাহাজাদা নিষ্কণ্টক হলেন। নিশ্চিন্ত হলেন। আর তারপরেই লাগল গোলমাল। শাহী প্রাসাদের দেওয়ালে দেওয়ালে কাঁপতে থাকল ছায়া। সন্দেহের ছায়া। নিজেদের ভেতর যে বিশ্বাসটা ছিল, সেটা উবে গেল কর্পূরের মতন।

শাহাজাদা ফারুকের সন্দেহ, তাঁকে সরিয়ে দিয়ে আর কোনও

শাহাজাদাকে সৈয়দ ভায়েরা বসিয়ে দেবেন মসনদে। বাদশা নিজের হাতে যাঁকে কুতুব-উল-মুলুক কবেছেন, সেই মুলুকদার সত্যি সত্যিই বুঝে নেবেন তাঁর পাওনা-গণ্ডা। এ ভয়ঙ্কর সন্দেহে বাদশা এখন বাতিকগ্রস্ত। ওই সন্দেহের বসেই বাদশা আজ হুসেন আলি খাঁকে ঠেলে দিয়েছেন সুদূর দাক্ষিণাত্যে।

হুসেন আলি খাঁ দাঁতে দাঁত ঘষলেন। ঘেন্নায় নাকের ডগা কুঞ্চিত হল। মনে মনে বিড়বিড় করে উঠলেন, 'জান কবুল করে যে মানুষকে তখ্‌তে বসানো হল, সে মানুষের নেমক-হারামি সহ্য করা যায় না। তার লাশ টুকরো টুকরো করে কুকুরকে খাওয়াতে হবে।'

'হুজুর কিছু বলছেন?' মিশির লাল উৎসুক হয়ে তাকালেন খাঁ সাহেবের মুখের দিকে। 'হুজুরের যদি অনুমতি পাই, তাহলে ওই বাঈজী বেটীকে ডেকে পাঠাই।'

'ডাকো বাঈজীকে। অনেক দিন ভালো গান শোনা হয়নি।'

কিছুক্ষণ পরে বেগম মহলের এক বিবি এসে ঢুকল অপরিচিতা একটি সুন্দরী যুবতীকে নিয়ে। যুবতীর সঙ্গে এক কিশোরী। সকলের পিছনে গুটি গুটি এলেন মিশির লাল। খাঁ সাহেব বসে পড়লেন নিজের কুরশিতে।

সুন্দরী যুবতীটি বিনীত ভঙ্গিতে তসলিম জানিয়ে বলল, 'সেলাম আলেকুম। হজরত আমাকে তলব করেছেন বলে শুনলাম।'

'হ্যাঁ। শুনলাম, তুমি ভালো নাচতে পারো। গানের গলাও মিঠা। তা হঠাৎ তুমি আমাদের ছাউনিতে এসে ঢুকেছ কেন? তুমি কোনও গোপন খবর নিতে এসেছ?

'হ্যাঁ, আমার কপাল!' মৃদু হেসে কপালে করাঘাত করলেন সুন্দরী যুবতী। 'আমার মতন এক নাচনি বিবিকে শেষকালে হজরত কি না সন্দেহ করে বসলেন গুপ্তচর হিসেবে।

'ভেবেছিলাম হুজুরের সঙ্গে দিল্লি চলে যাব। সেখানে খোদ বাদশাকে গান শোনাব।'

'বাদশা! হঠাৎ ফারুক শিয়র কে গান শোনাবার ইচ্ছা কেন?'

'আজ্ঞে, আমার ইচ্ছাটা খামোখা নয় হজরত। শুনেছি, হিন্দুস্তানের বাদশা গানের কদর বোঝেন। গায়িকা আর বাঈজীদের তিনি দু'হাত ভরে ইনাম দেন। সেই ইনাম নেব না, হুজুর। তাছাড়া তেনাকেও আমি কিছু দিতে চাই। তেনার কাছে পৌঁছুলে, সেটাও আবার দেওয়া হবে।'

হুসেন আলি খাঁয়ের ভ্রু যুগল কুঞ্চিত হল। এই বাঈজী বিবি বলে কী। তাই একটু রুক্ষ স্বরেই খাঁ সাহেব বললেন, 'তুমি আবার কী দেবে বাদশাকে?'

'আজ্ঞে, তেনার চোখে একবারের তরে সুরমা পরিয়ে দেব। অনেক দিন

ধরেই তেনার জন্য যাদু সুষমা আমি রেখে দিয়েছি।'

'হুম্'— বাঈজীর কথায় রীতিমত বিরক্ত হলেন খাঁ সাহেব। রাগ চড়ে গেল তাঁর মাথায়। খ্যাক্ খেঁকে গলায় বললেন, 'ততদিনে যদি বাদশার বদল হয়ে যায়। নতুন কোনও বাদশা যদি তখ্‌তে বসে পড়ে।'

'যাঃ, তাই কখনও হয় না কি?'

মুখের সামনে এভাবে উল্টো কথা শোনা ধাতে নেই হুসেন আলি খাঁয়ের। তার কথার ওপর কথা বলবে, এমন দুঃসাহস কার? বিপরীত কথা শুনলে তিনি প্রলয় কাণ্ড বাধিয়ে বসেন।আজও হয়তো তাই করতেন। তবে সুন্দরী যুবতীর কমনীয় মুখশ্রী তাঁকে তেমন কিছু করতে দিল না। শুধু তাঁর চোয়াল দুটি ঈষৎ শক্ত হল। তিনি দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, 'বিবিজান, আপনার অনুমান যথার্থ নয়। দিল্লির শাহী মসনদ থেকে ফারুক বাদশাকে টেনে নামানো হবে। তিনি খুন হবেন।'

'তোহ্‌বা, তোহ্‌বা। এমন কথা শোনাও পাপ। তা মসনদে বসবেন কে? হজরতের সে রকম কোনও ইচ্ছে আছে নাকি।'

'ন্‌না। সে রকম ইচ্ছা থাকলে এই হুসেন আলি খাঁ অনেক আগেই মসনদে বসতে পারত। আমরা সৈনিক, সৈনিকের কাজই করে যাবো সারা জীবন।' গম্ভীর খস্‌খসে গলায় কথাগুলি বলে গেলেন খাঁ সাহেব। 'মসনদে বসবার জন্য যোগ্য এক শাহাজাদা আছেন। তিনিই বসবেন। যদি আখের গুছিয়ে নিতে চাও বিবিজান, তাহলে তাঁকে গান শোনাবার চেষ্টা করো। বিস্তর ইনাম মিলবে।'

'সেই যোগ্য শাহাজাদা কোথায়? দিল্লিতে?'

'না, তিনি আমার অতিথি হয়েই আছেন। তিনি আমার সঙ্গেই দিল্লি যাবেন।'

'বটে। তা ইনি কোন্ শাহাজাদা, হজরত? ইনি কি ফারুক শিয়রের ভাই!'

'ন্ না।' ধমকে উঠলেন হুসেন আলি খাঁ, 'ইনি হলেন বাদশা আলমগীরের নাতি, শাহাজাদা আকবরের ছেলে। এর নাম, জওয়ান্ বখ্‌ত।'

বাঈজী একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'বাঃ, ভারি সুন্দর নাম তো। হজরত যদি অনুমতি করেন, তাহলে আজ সন্ধ্যাতেই শাহাজাদাকে গান শোনাই।'

'হুম্, এতক্ষণ ধরে তুমি আমাকে দিয়ে অনেক কথাই বলিয়ে নিলে বিবিজান। কিন্তু তোমার পরিচয়টাই তো খুলে বললে না। কী নাম, তোমার?'

'আজ্ঞে, এ বাঁদি একান্ত ভাবেই আপনাদের নোকর। হুকুমের বাঁদি। তবে আল্লাহ্ যখন এ দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন, তখন একটা নাম আছে বই কি। এ বাঁদির নাম, জুলেখা। এক সময় দিল্লিতে ছিলাম। ভালো এবং বনেদী ঘরেই

আমার জন্ম হয়েছিল জনাব। দেখেই বুঝতে পারছেন যে আমি এক কালে রূপসী ছিলাম। তা এই রূপই আমার কাল হল। এক শাহাজাদার কামনার নজরে পড়লাম। তাঁর শিকার হলাম। তারপর গড়াতে গড়াতে বাঈজীর জীবনে আজ চলে এসেছি।'

'ওই মেয়েটি কে? তোমার মেয়ে?'

'না, কুড়িয়ে পেয়েছি। আমার কোনও ছেলেপুলে নেই।'

'ওকে তুমি বেচে দেবে?'

'আজ্ঞে না, পালন করব। ইচ্ছে আছে, ভাল দেখে বিয়ে দেব।' কথাটি বলতে বলতে ভারি হয়ে গেল জুলেখা বাঈজীর গলা।

খাঁ সাহেব খাড়া হয়ে বসলেন কুরশির ওপর। বাঈজীকে নজরে রাখা দরকার।

মিশিরলাল, এই বিবি হলেন আমাদের অতিথি। আর পাঁচজন সাদামাটা বিবির মতো এঁকে রাখলে হবে না। এঁকে রাখতে হবে বিশেষ যত্ন করে। আর এঁর ওপর নজর দারি করবার দায়িত্ব তোমার ওপর ছেড়ে দেওয়া হল।'

নিজের শিবির থেকে সকলকে বিদায় করে দিয়ে খাঁ সাহেব আবার বসলো নিজের পরিকল্পনা নিয়ে। তাঁর জেবের ভেতর থেকে হাত ঢুকিয়ে বের করলেন ভাঁজ করা একটি কাগজ। এটি একটি রাস্তার নক্‌শা। শাহাজাদা ঔরংজেব একদিন দক্ষিণ দেশ থেকে যে পথ ধরে আগ্রার দিকে রওনা দিয়েছিলেন, এ নকশা সেই পথের। পথের ধারে কোথায় নগর কোথায় নদী এবং কোথায় জঙ্গল আছে। বিশেষ বিশেষ সঙ্কেত দ্বারা চিহ্নিত। এপথ সর্বত্র সমতল নয়। মাঝে মাঝে রয়েছে রুক্ষ পাহাড়। এইসব জায়গায় কীভাবে জল ও খাদ্য সংগ্রহ করা যাবে, তার কথাও ওই নকশায় বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। মাঘ মাসের তৃতীয় সপ্তাহে ঔরঙ্গজেব তখ্‌ত দখলের জন্য যাত্রা করেছিলেন। দক্ষিণদেশে তখন কন কনে ঠাণ্ডা। তিনি যাত্রা করেছিলেন ঔরংগাবাদ থেকে। তেরো দিন পরে পৌঁছেছিলেন বুরহানপুরে। এখানে বেশ কিছু দিন বসে থেকে চৈত্র মাসে বুরহানপুর ছেড়ে চলে এসেছিলেন নর্মদার তীরে। আকবরপুরের কাছে তিনি নর্মদা অতিক্রম করেন। চৈত্রের শেষে এসে পৌঁছুলেন উজ্জয়িনী। এই বিখ্যাত নগরটি থেকে তেরো ক্রোশ দূরে দীপালপুর। এখানে ওই দীপালপুরের কাছে মুরাদের বাহিনীর সঙ্গে ঔরঙ্গজেবের মিলন ঘটল। সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা পঁয়ত্রিশ হাজারে গিয়ে পৌঁছুল। এরপরে ধার্মাত। যশোবন্তের সঙ্গে সংঘর্ষ। এ সংঘর্ষে যশোবন্তের পরাজয়। ধার্মাতের পর বালুচপুর। তারও পরে সামুগড়। ওই সামুগড়েই ঔরংজেবের নসিব নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল।

নকশাটিতে বার কয়েক চোখ বুলিয়ে নেওয়ার পর হুসেন আলি খাঁ সোজা

হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। বুঝলেন, বুরহানপুর হয়ে উজ্জয়িনী অবধি তিনি ঔরংজেবের পথেই হাঁটবেন। এরপর তিনি পা বাড়াবেন মাণ্ডেশ্বরের দিকে। পঁয়ত্রিশ হাজার না-হোক, পঁচিশ হাজার সৈনিক যে তাঁর সঙ্গে এগিয়ে চলবে, এবিষয়ে তিনি নিশ্চিত।

'হুজরত। হুজুর।

চমকে উঠে পিছন ফিরে তাকালেন হুজুর হুসেন আলি খাঁ। দ্বাররক্ষী হাবসি খোজা তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে। তার হাতে লেফাপা-মোড়া একটি চিঠি। বুঝতে অসুবিধা হল না, কোনও গোপন দূতের মাধ্যমে এটি এসে তাঁর কাছে পৌঁছেছে। লেফাফা ছিঁড়ে ভেতরের কাগজটি এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেললেন খাঁ সাহেব' 'বেরাদর হুসেন, আমি এখন তোমার অপেক্ষায় প্রহর গুনিতেছি। ফারুক শিয়রের আচরণ ভাল নয়। গুপ্ত ঘাতক দিয়া আমাদের হত্যার ষড়যন্ত্র হইতেছে। সেই ঘাতকরা মর্দ কী মর্দানা, তাহাও আঁচ করিতে পারিতেছি না। তাহারা যে কোনও মুহূর্তে আমাদের ওপর ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারে। সাবধান। রাজপুত ও মারাঠাদের তুমি হাত করিতে পারিয়াছ জানিয়া নিশ্চিত হইলাম। পেশোয়া বালাজী ভাট এবং রানা শাহ তোমার সহিত দিল্লি আসিতেছেন জানিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। নতুন শাহাজাদার ব্যাপারটি জানিয়া ফারুক আতঙ্কিত হইয়াছেন। বেচারির ভেতর এই আতঙ্ক জাগাইয়া রাখিতে হইবে। ইতি— তোমার দাদা হাসান আলি খাঁ।

॥ছয়॥

নতুন জীবন

নিচের পাহাড় থেকে উঠে আসছে শব্দটা। উঠে আসছে গাছগাছালির ভেতর দিয়ে পাক খেতে খেতে। ডংকা বাজালে যেমন শব্দ ওঠে, অনেকটা

ডংকার এই আওয়াজটা উৎসবের না জানোয়ার খেদানোর, তা ঠাহর করতে পারল না জোয়ান বখ্‌ত। বিশাল একটি আমগাছের মাথায় উঠে সে তখন একটি মৌচাক ভেঙে মধু সংগ্রহে ব্যস্ত। হাতে তার একটি জ্বলন্ত মশাল। মশাল দিয়ে সে তখন ঝাঁক ঝাঁক মৌ-মাছির সঙ্গে লড়াই করছে। চারদিকে মৌ-মাছির বেড়া-জাল। অজস্র মৌ-মাছির ভেতর আটকে গেছে জোয়ান বখ্‌ত। দু'দশটা কামড়ও দিয়েছে তার গায়ে। পাহাড়ি মৌ-মাছির হুলে বড় বিষ। হু হু করে জ্বলছে তার গা। তবু জোয়ান বখ্‌ত অবিচল। মৌ-চাকটিকে প্রায় দখলের ভেতর নিয়ে এসেছে।

এমন সময় ডংকাটি বেজে উঠল। প্রথমে একটানা ডিম্ ডিম্। পরে দ্রিম্ দ্রিম্। মনে হল, এ ডংকা উৎসবের নয়। জানোয়ার খেদানোর। লোকালয়ে হঠাৎ কোনও জানোয়ার ঢুকে পড়লে এইভাবে ঢ্যাড়া পিটিয়ে তাদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়। এইভাবে ডংকা বাজিয়ে জোয়ান বখ্ত নিজেও কতদিন জানোয়ার তাড়িয়েছে। তাড়া খাওয়া জানোয়ার বড় হিংস্র। পালাবার সময় সামনে যাকে পায়, তাকে ঘায়েল করে। বুনো ভালুকরা তাড়া খেয়ে উঠে আসে ওপরের দিকে। এই মুহূর্তে তাড়া খেয়ে বুনো ভালুকের ওপরে উঠে আসা বিচিত্র নয়। দারুণ ভয়ে ঘুম ভেঙে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই জোয়ান বখ্ত বুঝতে পারল যে সে এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিল। কিন্তু এখনও সেই ডংকার শব্দ কেন? স্বপ্ন চলে যায়, কিন্তু শব্দ যায় না কেন? চোখ বন্ধ করে আরও নিবিড়ভাবে শুনতে চেষ্টা করল আখ্তার। এবার দ্রিমি দ্রিমি শব্দের সঙ্গে গলার এক কলি গান শুনতে পেল সে। খুব কাছে বসে গভীর অন্তরঙ্গদের সঙ্গে কে এক গায়িকা গান গেয়ে চলেছে। দ্রিমি দ্রিমি শব্দ হারিয়ে গেল। গায়িকা তখন গাইছেন,

সগরী রঈন্ মোহে সঙ্গ জাগা।
ভোর ভঈ তব বিছুড়ন লাগা।।
ইস্‌কী বিজুড়ী ফাটত হিয়া।
আয়ে সখী সাজন? —না সখী দিয়া।।

এমন একটি প্রেমের গান শুনে চুপচাপ শুয়ে থাকা যায় না। চোখ মেলে তাকাল জোয়ান বখ্ত। সঙ্গে সঙ্গে সে বুঝতে পারল যে সে আর জোয়ান বখ্ত নেই। সে এখন শাহাজাদা। তার বাবার নাম ইব্রাহিম খাঁ নয়। বাবার নাম বাদশাজাদা মুহাম্মদ আকবর। জঙ্গলে ঢুকে শিকার করতে গিয়ে সে কৌতূহলী হয়ে নেমে এসেছিল হুসেন আলী খাঁয়ের ছাউনির কাছে। সেখানে সে মারাঠা সৈনিকদের হাতে বন্দি হয়ে গেল। বন্দি হবার সঙ্গে সঙ্গেই তার পরির্চিতি বেমালুম বদলে গেল। জন্মদাতা ইব্রাহিম খাঁ যাকে নিজের অপদার্থ ছেলে বলে দিন রাত্তির ভর্ৎসনা করতেন, সেই ছেলের রাতারাতি নসিব খুলে গেল। জোয়ান খাঁ আরও যা যা জানল, তাহল তার ভায়ের নাম বুলান্দ্ আখতার। আর তার বোনের নাম আনার কলি নয় সফি-উন্নিসা।

'আসুন শাহাজাদা আসুন। আসতে আজ্ঞা হোক। আপনারমতোএকজন যোগ্য মুঘল সন্তানের জন্য আমরা হাঁ করে বসে আছি। আপনার পায়ের ধুলো পড়ে আমাদের এ গরিবখানা পবিত্র হল। বাদশাজাদা মুহাম্মদ আকবর স্বপ্ন দেখেছিলেন হিন্দুস্তানের তখ্‌তে বসবার। বসতে পারেননি। তাড়া খেয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন হিন্দুস্তান ছেড়ে। জান বাঁচিয়েছিলেন বটে, কিন্তু মান বাঁচাতে পারেননি। আপনি আজ তাঁর মান বাঁচাবেন। আপনি হলেন হিন্দুস্তানের ভাবী সুলতান।' এসব কথা শুনে প্রথম প্রথম ভ্যাবাচাকা খেয়ে

গেলেও সৈয়দ হুসেন আলি খাঁকে দেখে কিছুটা ভরসা পেয়েছিল জোয়ান বখ্‌ত। বেঁটেখাটো হলেও, চেহারায় জবরদস্ত ছিলেন খাঁ সাহেব। মুখের আদলেও ছিল আশ্চর্য এক বিশ্বস্ততা। জোয়ান বখ্‌তের মনে হয়েছিল, এই মানুষটির কাছে সব কিছু খোলাখুলি বলা যেতে পারে। তাকে ঘিরে যে একটি মিথ্যার আবর্ত তৈরি হয়েছে, তা ভেঙে দেওয়া দরকার। কাচের প্রাসাদে কে বাস করতে চায়।

'খাঁ, সাহেব। আপনার কাছে আমি একটি কথা কবুল করতে চাই, শুনবেন সে কথাটা?'

'একশবার শুনব। হাজারবার শুনব। হজরতের হুকুম আমাকে শুনতেই হবে। এ বান্দাকে আপনি হুকুম করুন জনাব!'

'আমি শাহাজাদা নই। বাদশাজাদা মুহম্মদ আকবর আমার আব্বাজান নন, ইব্রাহিম খাঁ হলেন আমার বাপ্‌!'

'চোপ্‌!' গর্জন করে উঠলেন খাঁ সাহেব। মুহূর্তে তাঁর চেহারা বদলে গেল। চোখ দুটিতে দপ করে আগুন জ্বলে উঠল। বিশ্রী কর্কশ গলায় খাঁ সাহেব ধমক দিয়ে বলে উঠলেন, 'আপনার নিজের পরিচয় আপনি জানেন না শাহাজাদা। আমরা জানি আপনি কে? কী আপনার পরিচয়। মহারাজ শাহ্‌ আপনাকে চড়া দামে আমাদের কাছে হাত বদল করেছেন। আমরা আরও চড়া দাম হাঁকবো বাদশা ফারুক শিয়রের কাছে। বাদশা যদি সেই চড়া দাম না দিতে পারেন, তাহলে তাঁকে মসনদ থেকে নেমে আসতে হবে। তা ফারুক নেমে গেলে মসনদ তো আর ফাঁকা যেতে পারে না। ওই ফাঁকা মসনদে বসবেন আপনি। আপনার মতো যোগ্য লোককেও তো আমরা অবহেলা করে দূরে সরিয়ে রাখতে পারি না হজরত।' আগুনের হল্কা যেন ঠাণ্ডা হাওয়ায় বদলে গেল।

'আমাকে আপনারা বাদশা না-করে ছাড়বেন না?'

'না।'

'কিন্তু আমি যদি হিন্দুস্তানের তখ্‌তে বসতে না চাই?'

'আপনার ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনও মূল্য আমরা দিই না। আমাদের সকলের ইচ্ছাই বাদশার ইচ্ছা। আমাদের ইচ্ছামত আপনাকে চলতে হবে।'

'যদি না চলি, পালিয়ে যাই?'

জোয়ান বখ্‌তের কথা শুনে হা-হা করে হেসে উঠলেন খাঁ সাহেব। 'শাহাজাদা, শুনেছি আপনি জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে ভালোবাসেন। পাহাড়ী অজগরের শিকার ধরা দেখেছেন নিশ্চয়।

'দেখেছি।'

'শিকার ধরবার পর, পাহাড়ি সাপটা কি তাকে ছেড়ে দেয়?'

'ন্ না।'

আপনি হলেন পাহাড়ি পাইথনের শিকার। এসব না-ভেবে বিশ্রাম করুন।'

এই ভয়ঙ্কর কথা শোনবার পর একেবারে গুটিয়ে গেল জোয়ান বখ্ত। আর সে সাহস পেল না কাচের প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে আসতে। তার জীবন থেকে হারিয়ে গেল তার বাবা ইব্রাহিম খাঁ। হারিয়ে গেল মাওয়ালি ছেলেদের বন্ধুত্ব। শুকনোপাতারমতোখসে পড়ল তার জঙ্গলের জীবন। রাতারাতি সে হয়ে গেল শাহাজাদা। আরামে আয়াসে তার দিন কাটে। তার স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য আলাদা একটি শিবির বরাদ্দ করা হয়েছে। শিবিরের মাথায় লাল চন্দ্রাতপ। তার চুড়োয় পত্ পত্ করে উড়ছে শাহী পতাকা।

স্বপ্ন থেকে বেরিয়ে জোয়ান বখ্ত পিট্ পিট্ করে চোখ মেলে চাইল। চোখ মেলে চাইতেই দেখল রেশমি বাঁদি তার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে। ফের চোখ বুজে বলল, 'রেশমি বিবি!' আজ ফজরে গান গাইছে কে?'

'আপনার পছন্দ হয়েছে। এ মেয়েটি নতুন আমদানী!'

'নতুন? দিল্লি থেকে এসেছে বুঝি?'

'শুনেছি, দিদির হাত ধরে যেচেই এসেছে এই শিবিরে। হুজুরকে গান শোনাতে।'

'আমাকে গান শোনাতে? আশ্চর্য!' জোয়ান বখ্ত অন্যমনস্ক গলায় বলল, 'ওকে একবার নিয়ে এস তো।'

শাহাজাদার হুকুম। কক্ষান্তর থেকে ধরে নিয়ে আসা হল জুলেখা বাঈয়ের সঙ্গিনী সেই কিশোরী মেয়েটিকে। বাঁদি রেশমির হাত ধরে সেই কিশোরী মেয়েটি একান্ত সংকোচে শাহাজাদার সামনে এসে দাঁড়াল। কুসুম কুসুম ভোরে আসমানের গায়ে যে রঙ্ ফুটে ওঠে, মেয়েটির গায়ের রঙ অনেকটা সেই রকম। বিবিমহলের আর সকল থেকে একেবারে আলাদা। প্রথম যৌবনের আল্‌গা শ্রী মেয়েটির সর্বাঙ্গে। মুখটি লজ্জায় অবনত। চোখ দুটি বড় বড় । স্নিগ্ধ ভুরু জোড়া উড়ন্ত পাখির ডানা।

'তুমিই এতক্ষণ গান গাইছিলে?'

'জি।'

'তোমার নাম কী!'

'আশমানী। জুলেখা বাঈ আমাকে এই নামেই ডাকেন।'

'বটে!' জুয়ানবখ্ত হাসল, 'জুলেখা বাঈ কে? কই, নাচের মজলিশে এখনও এই বাঈকে দেখিনি তো!'

রেশমি এদের দু'জনের কথার ভেতর ঢুকে পড়ল। বলল. 'জুলেখা বাঈকে আপনি শীগ্‌গিরই দেখবেন শাহাজাদা। কয়েকদিন আগেই তাঁর মজলিশে আসবার কথা ছিল। আসতে পারেননি। অসুস্থ। হয়তো আজ

সন্ধ্যাতেই আপনি তার দেখা পাবেন। উনিও এসেছেন আপনাকে নাচ দেখাতে। গান শোনাতে।

জোয়ান বখ্‌ত রেশমি বাঁদির কথায় কান দিল না। সে স্থির দৃষ্টিতে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল কিশোরী আশমানির দিকে। মনে হল, এই রকম একটি মেয়েকে সে যেন কোথায় দেখেছে।

'জুলেখা বাই তোমার কে হন আশমানি?'

'আমি অনাথিনী। দিদিই আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন।'

'তোমার দেশ কোথায়?'

'জানি না। শুনেছি বুরহানপুরে আব্বাজান থাকতেন।'

'তিনি এখন কোথায়?'

'বেহেস্তে।' আশমানির চোখ দুটি ছল ছল করে উঠল। তারপর আমার মাকে আত্মীয় স্বজনেরা তাড়িয়ে বিষয় সম্পত্তি জোর করে কেড়ে নেয়। বুরহানপুর থেকে আমরা চলেছিলাম দিল্লির দিকে। পথে উলাউঠায় মা মরল।'

'তুমি গান শিখলে কার কাছে?'

'দিদির কাছে।'

জোয়ান বখ্‌ত হাসল। তার মনে হল, সত্যি সত্যিই সে আজ যেন শাহাজাদা। তার নিজের ভেতর ঘুমিয়ে রয়েছে এক দয়ালু বদান্য সুলতান। রাশি রাশি ঐশ্বর্য রয়েছে তার জেবে, তার হাতের মুঠোয়। সৈয়দ হুসেন আলি খাঁ যেদিন থেকে তাকে শাহাজাদা বলে বরণ করে নিয়েছিল, সেই প্রথম দিন থেকে তাকে সাজাতে তিনি কসুর করেননি। গায়ে পরিয়ে দিয়েছিলেন উত্তম মহার্ঘ কামিজ। পরিয়ে দিয়েছিলেন রেশমি পা-জামা। মাথায় পরিয়ে দিয়েছিলেন রত্নখচিত তাজ। গলায় দুলিয়ে দিয়েছিলেন দু'তিন ছড়া হার। কোনওটি মোতির, কোনওটি হিরের। কোনওটি আবার বহু রত্ন খচিত শাহী হার। হাতে ও আঙুলে আঙুলে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল গুটি আটেক মূল্যবান আংটি।

সে উঠে দাঁড়িয়ে আঙুল থেকে চুনির একটি আংটি খুলে আচমকা পরিয়ে দিল আশমানির আঙুলে। বেচারি কুঁকড়ে গেল লজ্জায়।

'এত লজ্জা কিসের? শাহাজাদাকে গান শোনাবার জন্য এটি হল তোমার ইনাম।'

থরথর করে কাঁপতে থাকল মেয়েটি। কোনও কথা না বলে, কোনও সৌজন্য না দেখিয়ে দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

এই তুচ্ছ ঘটনার দিন থেকেই জোয়ান বখ্‌তের নতুন করে যেন আর একটা জীবনের সূচনা হল। রাতারাতি সে হয়ে উঠল সাবালক।

গত কয়েকদিন ধরে যে কানুনের ভেতর দিয়ে জোয়ান বখ্‌ত চলছিল, সেভাবে আর সে চলল না। চলতে চাইল না। হাতমুখ গোসোল করে, পোশাক বদলে জোয়ান বখ্‌ত যখন গিয়ে ভোজনাগারে হাজির হল, তখন চারদিকে রীতিমত চাপা ঔৎসুক্য। বাঁদি মহলে চলছে চুপি চুপি কথা। ফিস্‌ফিসানি। রেশমি বিবি রূপার রেকাবে সাজিয়ে নিয়ে এল নানা স্বাদের মেঠাই। গোলাপি বাঁদি আনল সোনার পাত্রে নানা ধরনের ফল আর নান, 'জিলাবি'।

খেয়ে দেয়ে সে চলে গেল নিজের কক্ষে। অন্যদিন এই সময় জোয়ান বখ্‌ত একা একা নিরিবিলিতে সময় কাটাত। উঁচু পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলত। নতুবা বাঁদি রেশমি কিংবা গোলাপির সঙ্গে শতরঞ্জ খেলা খেলত।

আজ শাহাজাদার কক্ষ থেকে হঠাৎ এক তলব গেল সৈয়দ হুসেন আলি খাঁয়ের কাছে। এখনই তাঁকে চাই। খোজা খোদাবক্‌স্ হাঁফাতে হাঁফাতে গিয়ে খাঁ সাহেবকে বলল, 'হুজুর! আপনার তবল পড়েছে!'

হুসেন আলি খাঁ যথেষ্ট বিরক্ত হলেও, শেষ পর্যন্ত তিনি এসে হাজির হলেন শাহাজাদার শিবিরে। শাহাজাদা বাইরের কামরায় বসে এক মনে সেই সময় একটি কেতাব পড়ছিলেন। বাবা ইব্রাহিম খাঁ বহুবার চেষ্টা করেছেন ছেলেকে কেতাবের দিকে মুখ ফেরাতে। ছেলের মুখ কেতাবের দিকে কখনও ফেরেনি। তবে বাবার চাপে পড়ে তার পড়বার বিদ্যেটুকু হয়েছিল। নতুবা পাহাড়ি জঙ্গলই ছিল তার প্রিয় পাঠ্য বই। প্রিয় কেতাব। আজ হঠাৎ একরাশ কেতাব দেখে জোয়ান বখ্‌ত একটি কেতাব খুলে গ্রন্থের লেখাগুলি পড়তে চেষ্টা করল। দু'চার পঙ্‌ক্তি পড়বার পর সে আবিষ্কার করল যে ইচ্ছে করলে এরকম কেতাব সে পড়তেই পারে।

জোয়ান বখ্‌তের পঠিত কেতাবটি ছিল, 'ইরানি বুলবুল'। ইরান দেশের নানা কবির গজলের সংকলন।

'শাহাজাদা, আপনি আমাকে তলব করেছেন? সৈয়দ হুসেন আলি খাঁ ভারি ভারি পা ফেলে এগিয়ে এলেন শাহাজাদার কাছে। খাঁ সাহেবের মুখটা গম্ভীর। গলার স্বর কর্কশ।

'আমারই যাওয়া উচিত ছিল আপনার কাছে যেতামও। কিন্তু আটকে গেল সহবতে।'

'সহবত? আমার কাছে যাওয়ার জন্য?'

'হিন্দুস্তানের ভাবী বাদশা তাহলে হেঁটে হেঁটে গিয়ে হাজিরা দিতে পারে তাঁর সেনাপতির তাঁবুতে? কেতায় আটকাবে না! সহবতে বাধবে না?'

হুসেন [illegible] অবাক হলেন। তবে সাবধানও হলেন। বললেন, 'ঠিকই বলেছেন, হুজুর! এভাবে আমি জিনিসটা ভেবে দেখিনি। আপনি আমাকে

তলব করেছেন কেন, সেটাই খুলে বলুন।'

'আমার একটি ঘোড়ার দরকার। কেবল ঘোড়া নয়, কিছু অস্ত্রশস্ত্রেরও দরকার।'

'এসব নিয়ে আপনি কী করবেন?'

'আমি শিকারে যাব'।

হুসেন আলি খাঁ দাড়িতে আঙুল চালাতে চালাতে বললেন, 'শাহাজাদা শিকারে যাবেন, এতো বড়ো আনন্দের কথা। অবশ্যই যাবেন। হাজার বার যাবেন। তবে দু-চারটে হরিণ আর নেকড়ে মেরে কী লাভ? আপনার জন্য বড় শিকারের ব্যবস্থা করা আছে। আপনি একেবারে দিল্লি যাওয়ার পর শিকারে নামবেন। এক উদ্যত বেয়াদব বাদশাকে তখ্ত থেকে টেনে নামাতে হবে আপনাকে। সেটাই হবে আপনার জীবনের বড় শিকার। পারবেন না?'

'কিন্তু এখন একটা ঘোড়া দিতেও কি অসুবিধা আছে।'

'না, আমাদের অসুবিধার কিছু নেই। কিন্তু মারাঠীরা উল্টো বুঝবে, জনাব। তেনারা আমাদের সঙ্গে যেসব চুক্তি করেছে, সেই সব চুক্তির খুঁটি হলেন আপনি। আমাদের মতন ম্যাড়ারা আপনার মতো খুঁটি ধরে লড়ে যাচ্ছি। ঘোড়া দিলে আপনি যদি পালিয়ে যান, তাই দেওয়া হবে না।'

জোয়ান বখ্ত আর কথা বাড়ালেন না। একবার শুধু বিড় বিড় করে বললেন, 'রাজা শাহর সঙ্গে আমি দেখা করতে চাই।'

'এ আর কী কঠিন কাজ জনাব। রাজা শাহর সঙ্গে শিগ্‌গিরই আপনার দেখা হবে। তিনিও আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান। তাঁদের দাবিসনদে তাঁরা আপনার একটা স্বাক্ষর ধরে রাখতে চান। এতে আপনার সুবিধাই হবে। বাদশা হয়ে বসলে ওঁরাই হবেন আপনার বিশ্বস্ত রক্ষী। হিন্দুস্তানের তখ্‌তে ওরা আপনাকে টিকিয়ে রাখতে সহায়তা করবে। সই দিতে আপত্তি করবেন না জনাব।'

জোয়ান বখ্ত গম্ভীর ভাবে বলল, 'রাজা শাহর সঙ্গে এ বিষয়েই আমি আলাদাভাবে কথা বলব।'

কথাগুলি বলে জোয়ান বখ্ত নিজেই অবাক হল। সে বুঝতে পারল, তার নিজের ভেতর বিলকুল পরিবর্তন হয়ে চলেছে। বাইরের অবয়বে সে জোয়ান বখ্ত। ভেতরে ভেতরে কিন্তু সে এক শাহাজাদা। মুঘল বংশের ছেলে। মুঘলদের ছেলেরা সাহসী। ডাকাবুকো। বেপরোয়া। উৎকৃষ্ট শরাব আর সুন্দরী মেয়েদের ওপর তাদের আকর্ষণ দুর্বার। জীবনকে তারা ভোগ করতে জানে। খরচ করতেও জানে। বাবা ইব্রাহিম খাঁ ছিলেন সংযত চরিত্রের মানুষ। ভোগ-লালসা তিনি একদম সহ্য করতে পারতেন না। মুঘল সন্তানদের সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল খুবই খারাপ। বলতেন, এরা সকলেই লম্পট। কামুক। নেশাগ্রস্ত।

ইব্রাহিম খাঁয়ের কঠোর শাসনে জোয়ান বখ্‌ত কোনওদিন পাপের পথে হাঁটবার সুযোগ পায়নি। আব্বাজানের মতো তার লেখাপড়া হয়নি বটে, কিন্তু তাই বলে সে অমানুষও হযনি।

কিন্তু শাহাজাদার খোলস পরে থাকতে থাকতে জোয়ান বখ্‌ত নিজেকে এখন শাহাজাদা বলেই ভাবতে আরম্ভ করেছে। একটু একটু করে শাহাজাদার ভার ওর ওপর ভর করতে থাকল।

একদিন বিকেলের দিকে জোয়ান বখ্‌ত কুরশির ওপর গা এলিয়ে দিয়ে হুঙ্কার ছাড়ল, 'রেশমি বিবি, শরীর ভাল নেই, আমার শরাব চাই।'

এল শরাব। ঘোর রক্তবর্ণ তেজাল শরাব। স্ফটিক পাত্রে ঢেলে সেই শরাব অনভ্যস্ত শাহাজাদার দিকে এগিয়ে দিল বাঁদি রেশমি। সরবতের মতো ঢক ঢক করে বেশ খানিকটা শরাব খেয়ে নিল জোয়ান বখ্‌ত। আঙুরজাত মদ্য। যেমন ঝাঁজালো, তেমনি নেশারু। এই তরল পানীয়টি খাবার কিছু পরেই ঝিম্‌ মেরে গেল জোয়ান বখ্‌ত। কুরশির ওপর আরও এলিয়ে দিল নিজেকে।

এইভাবে বেশ কিছুক্ষণ থাকবার পর হঠাৎ রেশমির দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওটা কিসের শব্দ? ওই যে ডিম্‌ ডিম্‌ দ্রিমি দ্রিমি করে বাজছে!'

'মারাঠি সৈনিকরা ঢাক বাজিয়ে আনন্দ-ফুর্তি করছে।'

'বিজয়োৎসব?'

'আনন্দোৎসব।'

'কিসের এত আনন্দ?'

'আমাদের সঙ্গে দিল্লি যাবে, তাই।'

'আমার তা বিশ্বাস হয় না। এ এক গভীর ষড়যন্ত্র। আমাকে নিয়ে কিছু একটা গোলমাল পাকানোর চেষ্টা হচ্ছে। আমি যা নই, সেই রকম একটা কিছু আমাকে বানানো হচ্ছে। এরপর জংলীদের হাতে আমাকে তুলে দেবে। তারা আমাকে খুন করে ডংকা বাজিয়ে নাচবে।' বলতে বলতে আবেগের মাথায় হু-হু করে কেঁদে ফেলল জোয়ান বখ্‌ত। রেশমি এগিয়ে গেল সান্ত্বনা দিতে। কাঁদতে কাঁদতে জোয়ান রেশমিকে পাগলের মতো জড়িয়ে ধরে বুকে মুখ গুঁজলো।

'এ কী করছেন শাহাজাদা! আপনি আমাকে ছাড়ুন। আমার ওড়না ছিঁড়ে গেল। কামিজ খুলে গেল।'

রেশমির এই আকুতিতে জোয়ান বখ্‌ত অনুমাত্র কান দিল না। সে যে-ভাবে রেশমিকে পীড়ন করছিল, সেইভাবেই পীড়ন করতে থাকল।

পাগল আর মাতালকে বাঁদি রেশমির বড় ভয়। মাতাল শাহাজাদার হাত থেকে মুক্তির জন্য সে মরিয়া হয়ে উঠল। আরও খানিক ধস্তাধস্তির পর

রেশমি কামড়ে ধরল শাহাজাদার হাত। কামড়ের যন্ত্রণায় অধীর হয়ে শাহাজাদা ওরফে জোয়ান বখ্‌ত তার হাতের বাঁধন শিথিল করল। এই শিথিলতার সুযোগ নিয়ে শাহাজাদাকে ঠেলে দিল রেশমি। শাহাজাদা তাঁর শরীরে ভারসাম্য রাখতে পারলেন না। তাঁর টলমলে শরীরের খানিকটা গিয়ে পড়ল সোনার পালঙ্কে, আর খানিকটা গালিচা-মোড়া মেঝেয়। পালঙ্কের অংশটি ছিল কঠিন, এখানে আঘাত লেগে জোয়ান বখ্‌ত সংজ্ঞা হারালেন।

মুক্তি পেয়ে খানিকটা স্বস্তি পেল রেশমি। তাড়াতাড়ি সে গুছিয়ে ফেলল নিজের পোশাক। এলোমেলো চুলগুলিকে সে ছাঁদে আনল। ছিটকে যাওয়া পায়ের চপ্পলটিকে সে কুড়িয়ে আনল।

কিন্তু শাহাজাদার দিকে তাকিয়ে ভীষণভাবে চমকে উঠল সে। শাহাজাদা এভাবে হাত-পা ছড়িয়ে পালঙ্কে হেলান দিয়ে বিশ্রীভাবে শুয়ে আছেন কেন? ভয়ে ভয়ে রেশমি এগিয়ে গেল শাহাজাদার কাছে। আলগোছে হাত রাখল কপালে। গালে। বুকে। হঠাৎ চোখে পড়ল শাহাজাদার কপালের পাশে সদ্য থেঁৎলে যাওয়া ছোট্ট একটি ক্ষত-অংশ। ক্ষত অংশ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে বিন্দু বিন্দু রক্ত।

শাহাজাদার কপালের রক্ত দেখে ভীষণ ভয় খেয়ে গেল রেশমি। ভয়ে সে সিঁটকে গেল। হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। কাঁপতে থাকল সে ঠক্ ঠক করে। —শাহাজাদার সেবার জন্য বিশেষ দায়িত্ব দিয়ে এখানে তাকে পাঠানো হয়েছে। পাঠিয়েছেন হুসেন আলি খাঁ স্বয়ং। —খাঁ সাহেব নিজে রেশমিকে বুঝিয়ে দিয়েছেন তার কাজ-কর্ম কেমন হবে। কেবল পরিচর্যা বা সেবা নয়, শাহাজাদার সব রকম আবদারও সামলাতে হবে তাকে। সোহাগে-আদরে ভুলিয়ে রাখতে হবে। তাকে সাহায্য করবার জন্য দেওয়া হয়েছে গোলাপীকে। খাঁ সাহেবের নির্দেশ বড় কঠোর। শাহাজাদা যেন পালিয়ে না যায়। শাহাজাদার ফুর্তি যেন অটুট থাকে। তাঁকে খুশি করতে রেশমি কী গোলাপিকে যদি ইজ্জৎ কবুল করতে হয়, তাও করতে হবে। তার জন্য বাঁদিরা পাবে আলাদা ইনাম। আলাদা বকশিস্। —আর কাজে গাফিলতি দেখলে কুড়ি ঘা বেত আর একশ চাবুক খেতে হবে।

আরও খানিক শাহাজাদার দিকে তাকিয়ে দেখে রেশমি বাঁদি রীতিমত হতাশ হয়ে পড়ল। বুঝতে পারল, তাকে বাঁচতে হলে এখনই একটা বিহিত করতে হয়। চিকিৎসার জন্য এখনই তলব করতে হয় হেকিম সাহেবকে। তিনটে তাঁবু পেরিয়ে সেখানেও পৌঁছুতে গেলে কৈফিয়ৎ দিতে হবে পাহারাদারদের কাছে। তাছাড়া হেকিম সাহেবের কাছে পৌঁছুলেই হবে না। বুড়ো হেকিমকে সব কথা বুঝয়ে বলতে হবে। হেকিম সাহেব সন্ধ্যার মুখে এক ডেলা আফিম খান। আফিম খেয়ে নেশায় বুঁদ হয়ে থাকেন। এদিকে তিনি কানেও একটু খাটো আছেন। তাই তাঁকে আনতে হলে চারদিকে জানা

জানি হয়ে যাবে। অন্য কোনও উপায় খুঁজে বের করতে হবে। এখনই।

হারেমের বাঁদিরা কখনও সোজা পথে চলে না। রেশমিও চলল না। তার মাথায় যে বুদ্ধিটা এল, তাকে বাঁকা ও বেয়াড়া বুদ্ধিই বলাই শ্রেয়। সে আধো-শোয়া শাহাজাদাকে তুলে কোনও রকমে শুইয়ে দিল পালঙ্কের ওপর। গায়ে টেনে দিল একটি হাল্কা চাদর। এই মুহূর্তে কক্ষে গোলাপিও ছিল না। বাইরে অবশ্য পাহারাদাররা ছিল, কিন্তু সেই খোজা হাবসি পাহারাদারেরা ভেতরের খবর কিছু রাখে না।

শাহাজাদাকে একা ঘরের ভেতর শুইয়ে রেখে বাইরে বের হয়ে এল রেশমি। বের হবার আগে গায়ে চড়িয়ে নিল কালো মিশ মিশে একটি বোরখা।

বিবিমহলে তখন চলছে বাঁদিদের কলরব। কোলাহল। রঙ মহলেও তখন বসেছে গানের মহড়া। মাঝে মাঝে বাঈজীদের নাচের তালে পাওয়া যাচ্ছে ঘুঙুরের শব্দ। রঙ্ মহলে ঢুকে রেশমিবিবি সোজা চলে এল আশমানি বিবির কাছে। সেই আশমানি, যাকে শাহাজাদা গান শুনে ইনাম দিয়েছিলেন।

'এ কী বিবিজান, আপনি হঠাৎ আমাদের মহলে? এই অসময়ে? শাহাজাদা আপনাকে আটকাননি?'

'তিনিই তো আমাকে পাঠালেন।'

'কার কাছে?'

'তোমার কাছে। গান শুনবার জন্য।'

'সত্যি?' আশমানি খুশি হল। 'কিন্তু রঙ মহলের দারোগা হুকুম না করলে, আমি যেতে পারি না বিবিজান।'

'হুকুম আছে।' ছোট্ট একটি শাহী পাঞ্জা দেখাল রেশমিবিবি। 'এ পাঞ্জা কাছে থাকলে যেকোনও মহলে যেকোনও সময় যাওয়া যায়। এই পাঞ্জা তোমাকে আমি দিচ্ছি আশমানি। তুমি সোজা চলে যাও।'

'তা যাওয়া যেতে পারে। কিন্তু আমার দিদি জুলেখা বাঈ। মিশিরলাল। তাঁদের না জানিয়ে আমি তো যেতে পারব না।'

'জুলেখা বাঈকে আমি বলবার দায়িত্ব নিচ্ছি। কিন্তু মিশিরলালটা আবার কে?'

আশমানি হাসল। বলল, 'আমার আর দিদির ওপর নজর দারির ব্যবস্থা আছে মিশিরলালের ওপর। উনি হলেন খাঁ সাহেবের সেরেস্তাদার। ভারি কড়া। তবে মজাদার।'

রেশমি কিঞ্চিৎ সমস্যায় পড়ল। সে যেমন চেয়েছিল, তেমনটি হল না। এভাবে চললে তার পরিকল্পনা ভেস্তে যাবে। সুতরাং রেশমিকে আবার নতুন টোপ ফেলতে হল। সে একটু রাগত ভাবে বলল। 'মিশিরলালকে আমি চিনি

না বাপু। শাহাজাদাও চেনেন না। তা শাহাজাদার হুকুমের চেয়ে তেনার হুকুম নিশ্চয় বড় নয়। আমি হলাম হুকুমের বাঁদি। তুমি যদি না-যাও, আমি একাই চললাম। শাহাজাদাকে গিয়ে সব কথা জানিয়ে দেব।'

রেশমির কথায় রীতিমত ভয় পেয়ে গেল আশমানি। কার হুকুম যে বড় তা কি সে জানে না।

যাবার জন্য প্রস্তুত হল আশমানি। যাবার আগে বদলে নিল পরিধেয় কামিজ। চোখে পড়ল কাজল। হালকা ধরনের একটু প্রসাধন করে নিল। কেশ-বিন্যাস করল। গলায় ঝুলিয়ে দিল মোতির মালা। হাতে পরল সেই আঙটিটি।

'এই সন্ধ্যায় সেজেগুজে তুই কোথায় চলেছিস? কার হুকুমে?' জুলেখা বিবির প্রশ্নে আশমানি থমকে দাঁড়াল।

রেশমি আবার নতুন বিপদে পড়ল। তার পরিকল্পনা ছিল, শাহাজাদার ভালো-মন্দের সঙ্গে আশমানিকে জড়িয়ে দেওয়া। এই দুর্ঘটনার পরে শাহাজাদা আরোগ্য লাভ করলে আশমানিকে দেখে উনি অভিযোগের কথা ভুলে যাবেন। আর যদি ওই আঘাতের ফলে গোপন রক্ত ক্ষরণে শাহাজাদার এন্তেকাল হয়, তাহলে শাহাজাদার কক্ষে হাজিরা বিবি আশমানিকেই সবাই দোষ দেবে।

আশমানি পাছে গুলিয়ে ফেলে, তাই জুলেখার জিজ্ঞাসার জবাব দিতে রেশমি নিজেই এগিয়ে এল।

'বেগম জুলেখা বাঈ। সালাম। শাহাজাদার কাছে গান শোনাবার জন্য আমিই ওঁকে নিতে এসেছিলাম, বিবিজান।'

জুলেখা হাসল, 'তোমাদের শাহাজাদা মহানুভব। তাঁর খুব খ্যাতি শুনেছি। তা তাঁকে আমিও গান শোনাতে চাই। নাচ দেখাতে চাই। খাঁ সাহেবকে বলে বলেও আমি এ সুযোগ পাচ্ছি না। তা আশমানির সঙ্গে তুমি আমাকেও সেখানে একবার নিয়ে যেতে পারবে? অন্তত একবার চোখের দেখা দেখে আসতাম।' জুলেখার এই প্রস্তাবে সরাসরি না করতে পারল না রেশমি।

'এ তো ভারি আনন্দের কথা বেগম সাহেবা! ভারি সুখের কথা। আপনাকে দেখে শাহাজাদা আরও খুশি হবেন।'

'বাঁদি, তোমার কাছে শাহাজাদার হুকুম আছেতো।'

পাঞ্জাটা বাইরে বের করে দেখাল রেশমি।

সেই তিনটি তাঁবু অতিক্রম করে একই পথ পেরিয়ে রেশমি ওঁদের দু'জনকে নিয়ে চলে এল শাহাজাদার শিবিরে। ইতিমধ্যে গোলাপি ঘরে ঘরে জ্বালিয়ে দিয়েছে চেরাগ। চর্বি দিয়ে তৈরি এই চেরাগগুলি সাধারণের থেকে বেশি আলো দেয়। কক্ষগুলি তাই আলোয় ঝলমল করছে।

ঘরের ভেতর ঘর। শাহাজাদার কক্ষে পৌঁছুতে গুটি কয়েক কক্ষ অতিক্রম

করতে হল।

ভয়ে ভয়ে পা টিপে টিপে শাহাজাদার কক্ষে এসে ঢুকল রেশমি। বুকের ভিতর ঢিপ ঢিপ করছে। শাহাজাদা কি বেঁচে আছেন? তাঁর ক্ষতস্থান থেকে কি এখনও রক্ত ঝরছে?

ঘরে ঢুকে রেশমির ভয় খানিকটা কমল। দেখল, শাহাজাদা বিছানার ওপর আধশোয়া হয়ে বসে আছেন। আপন মনে বিড় বিড় করে বকে চলেছেন।

'জনাব। আপনার তবিয়ত ঠিক আছে তো?'

জোয়ান বখ্‌ত তার দীর্ঘ আয়ত চোখ দুটি বিস্ফারিত করে বলল, 'আমি তোমাদের শাহাজাদা নই। আমি জোয়ান বখ্‌ত।'

'সে কী হজরত! এই দেখুন, আপনাকে গান শোনাবার জন্য আশমানি বাঈকে ধরে এনেছি। এই দেখুন ছোটো বিবির সঙ্গে এসেছেন দিদি জুলেখাবাঈ।'

'জুলেখাবাঈ!' হাহা করে হেসে উঠলেন শাহাজাদা ওরফে জোয়ান বখ্‌ত। 'জুলেখা? কার দিদি? আমার দিদি জুলেখা নয় হে, আমার দিদি আনারকলি। ভারি সুন্দরী ছিল দিদি। দিল্লির ডাকুরা, তাকে ধরে নিয়ে গেল। খুন হয়ে গেল হাবশি নোকর!' নেশার ঘোরে আরও অনেক কথা বলে গেলেন শাহাজাদা। রেশমি বিবি ওই কথাগুলিকে মাতালের প্রলাপ বলে উড়িয়ে দিলেন।

অসংলগ্ন ওই কথাগুলি শুনে আশমানিও খুব ঘাবড়ে গেল। ভয় পেল। সিঁটিয়ে গিয়ে হাত ধরল জুলেখাবিবির। কিন্তু জুলেখা বিবির চোখে ফুটে উঠল অন্য এক রহস্যময় ভাষা। উজ্জ্বল আলোকিত কক্ষে জুলেখা বাঈ হঠাৎ যেন আরেক ঝলক আলো দেখতে পেল। এগিয়ে গেল সে শাহাজাদার পালঙ্কের দিকে। শাহাজাদার মুখের সামনে মুখ রেখে বলল, 'আমাকে চিনতে পারছেন, শাহাজাদা জোয়ান বখ্‌ত? এই বিবি আপনার দিদি নন?'

শাহাজাদা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন জুলেখাকে। বারকয়েক চোখ পিট পিট করলেন। তারপর বললেন, 'হতে পারে। আমার দিদি আনারকলির আদল আছে।'

'দিদি আনারকলিকে তোমার মনে আছে জোয়ান বখ্‌ত।'

'আছে। আছে। আছে।' খুবই বিরক্ত হলেন শাহাজাদা, 'আমি হলফ্‌ করে বলছি, আমার দিদি সফি উন্নিসা নয়।'

'বুলান্দ আখতার তোমার ভাই নয়?'

'না।'

'বাদশাজাদা আকবর তোমার আব্বাজান নন?'

'ন্ না।' দাঁতে দাঁত ঘষটালেন শাহাজাদা। চিৎকার করে বললেন, 'আমার বাবা হলেন, কাজী ইব্রাহিম খাঁ। হুসেন খাঁ আর রাজা শাহ্ আমাকে শাহাজাদা বানিয়েছে। আমাকে ওঁরা দিল্লির তখ্তে বসাবেন।'

জুলেখাবিবি শাহাজাদার কোনও কথার উত্তর দিল না। তার চোখ দিয়ে নেমে এল শুধু অশ্রুধারা। তবে বড় নিঃশব্দে। রেশমি আর আশমানির চোখের আড়ালে। পরের দিন সকালেই খাঁ সাহেব ছাউনি তোলবার নির্দেশ দিলেন। বিশাল জনপদ এবার ঘুম ভেঙে এগিয়ে চলল দিল্লির দিকে।

।।সাত।।
অজানা ভবিষ্যতের দিকে

সৈয়দ হুসেন আলি খাঁয়ের নেতৃত্বে বিশাল একটি জনপদ এগিয়ে চলেছে। চলেছে দক্ষিণ থেকে উত্তরের দেশে। এই জনপদে সকল রকম প্রাণীই আছে। হাতি আছে। উট আছে। কয়েক হাজার ঘোড়া আছে। আছে মাল পরিবহনের জন্য কয়েক হাজার খচ্চরও। আছে শিবিকা, পালঙ্ক এবং চতুরঙ্গ। বহু মানুষ চলেছে হেঁটে। পনেরো হাজার পদাতিক সৈনিক চলেছে তাদের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে। এরা কখনো চলেছে পাহাড়ের কোন দিয়ে। কখনো চলেছে রুক্ষ তৃণহীন প্রান্তরের ওপর দিয়ে। নির্জন জায়গার ওপর দিয়ে যখন এরা যায়, তখন কোনও সমস্যা থাকে না। ধীর শান্ত গতিতে এগিয়ে চলে এই জনপদ। গোলমাল বাধে তখন, যখন কোনও গ্রাম বা গঞ্জ পথের ওপর পড়ে। এই চলমান শান্ত জনতাই তখন আরেক রকম চেহারা নেয়। তারা দু'হাতে লুটপাট করতে থাকে। ফসল, টাকা পয়সা, সোনা-দানা, থালা-বাসন। শেষে গৃহস্থের যুবতী বউ এবং কিশোরী কন্যাও লুঠ হয়ে যায়। সেপাইদের এইসব কাণ্ড-কারখানার কথা সকলেই জানেন। সৈয়দহুসেন আলি খাঁও।

এই ভাবেই সেপাইরা চলছে। চলেছে একশ হাতি। পাঁচশ উট। চারশ গোরুগাড়ি চলেছে এক হাজার ফরাস, পাঁচশ মজুর, একশ ভিস্তি। চলেছে তাঁবুওয়ালা, দর্জি, চামার, কামার। মেথর। রাঁধুনী পাশাপাশি।

বিবি আর বাঈরা চলেছে পালকিতে। বেগমরা চলেছেন সোনার চাদর ঝোলানো শিবিকায়।

সৈয়দ হুসেন আলি খাঁ চলেছেন হাতির পিঠে, সু-সজ্জিত হাওদায়। শাহাজাদা ওরফে জোয়ান বখ্ত চলেছেন বিশাল একটি সাদা ঘোড়ায় চেপে। তাঁকে ঘিরে পাহারা দিয়ে চলেছে জনা ছয়েক অস্ত্রধারী ঘোড়সওয়ার। শাহাজাদার পিছনে রয়েছেন মিশিরলাল। তাঁর পিছনে গুটি চারেক পালকি। একটি পালকিতে জুলেখা বাঈ এবং তার আশ্রিত কিশোরী মেয়ে আশমানি। জুলেখা বাঈ মাঝে মাঝে পান খাচ্ছেন। গান গাইছেন। আর চটুল কটাক্ষ

হেনে মাঝে মাঝেই কৌতুক করছেন মিশিরলালের সঙ্গে। হিসেব সংরক্ষণে মিশিরলালে কঠোর হলেও, বিবিদের সঙ্গে মেলামেশায় তেমন নন। তাঁর ঘোড়া কখনো পালকি থেকে পিছিয়ে পড়ছে, কখনো চলছে পাশাপাশি। এক মুহূর্তের জন্যও এগিয়ে যাচ্ছে না।

একবার মিশিরলালের তার দেওয়া পান খাওয়ার ভঙ্গি দেখে খিল্ খিল্ করে হেসে ফেলল জুলেখা বাঈ। হাসতে হাসতে বলল, 'তোমার জাত চলে গেল মিশির জি। আমি পাঁচজনের কাছে একথা বলে দেব। তুমি তোমার ধর্মে পতিত হবে!'

'কেন, পতিত হব কেন? আমি অন্যায়টা কী করলাম?

'তুমি মুসলমান বিবির হাতে তৈরি পান খেলে। হিন্দুরা তোমার এ খবর জানতে পারলে, তোমাকে কি ছেড়ে দেবে?'

'তা ঠিক।' মিশিরলালের ভেতব উদ্বেগের ছায়া দেখা গেল।

'তুমি বরং এটাকে পাঁচ কান কোরো না। এই চেপে রাখার জন্য তোমাকে আমি বকশিস্ দেব।'

'কী বকশিস, মিশিরজি।'

'তুমি যা চাইবে, তাই।'

এই রকমই একটি পরিস্থিতির সুযোগ খুঁজছিল জুলেখা। গত সন্ধ্যায় জোয়ান বখ্‌তের সঙ্গে তার দেখা হল বটে, কিন্তু কথা বলবার তেমন কোনও সুযোগ পান নি। বেচারি তখন শরাব পানের পর পুরো মাতাল। তবে শরাব পান করেছিল বলেই সে নিজের গোপন পরিচয়টা হঠাৎ কবুল করে ফেলেছিল। জোয়ান বখ্‌ত নামটা শুনেই প্রথমে চমকে উঠেছিল জুলেখা। এ নাম তার বড় আপন নাম। পরে বাবার নাম, দিল্লির কথা এবং শেষে দিদির নাম বলাতে তার কাছে নতুন শাহাজাদাটির পরিচয় জলের মতো স্বচ্ছ হয়ে গেল। আল্লাহের কী বিধান!

বছরের পর বছর ঘুরতে ঘুরতে জুলেখা যা পায়নি, তা মুহূর্তে হাতের কাছে পেয়ে গেল! জুলেখা তার ভাইকে চিনে নিতে পারল, কিন্তু ভাই? হায়, সে তার দিদিকে চিনতে পারল না। দিদির চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ল জল।

এদিকে মিশিরলালের আর তর সইছে না। বকর বকর করতে করতে বিবিজান থেমে গেল কেন? বিবিজানের গোসা হল? যে বকশিস মিশিবলাল দিতে চাইল, তা বিবি জুলেখার পছন্দ হল না?

'ও বিবি জান, তোমার গোঁসা হল? বললাম তো যা তুমি চাইবে, তাই তোমাকে দেব।'

জুলেখা হাসল, 'যদি তোমাকে শাদি করতে চাই, সেই শাদিতে তুমি মত দেবে?'

'শাদি ?' চমকে উঠল মিশিরলাল। আমতা আমতা করে বলল, 'তা হলে সত্যি সত্যিই আমার জাত-ধর্ম চলে যাবে। তা যাক, আমি শাদিরই মত দিতে রাজি আছি, যদি তুমি তা চাও।'

জুলেখা বলল, 'এখনই তোমার জাত মারব না। দিল্লিতে গিয়ে তোমাকে শাদি করব কিনা ভাবব। এখন তুমি আমার একটা অনুরোধ রাখবে কি ? যদি রাখো, তাহলে বলি। ব্যাপারটা খুবই গোপন। তোমার পান খাওয়ার মতন। শাহাজাদার সঙ্গে গোপনে আমার একটু দেখা করিয়ে দিতে পারবে কি ?'

এখনো আমরা তিনদিন ধরে চলব। তিনদিন চলার পর থামব গিয়ে বুরহানপুরে। তাপ্তি নদী পেরিয়ে। নদীর ধারে যখন ছাউনি পড়বে, সেই সময় দেখা করিয়ে দেব। তবে খুব সাবধান। খাঁ সাহেব যেন টের না-পান।'

জুলেখা বিবি ছোট্ট একটি হাই তুলে বলল, 'বেশ তাই হবে। দেখি আমার নাগরের দৌড় কতদূর।'

আশমানি সব কথাগুলিই শুনল। বলল, 'দিদিভাই, একটা কথা বলব ?'

'বল।'

শাহাজাদাকে আমি গান শোনাতে চাই। তিনি আমার গান শুনতে চেয়েছিলেন। দেখা হলে তুমি তাঁর অনুমতি নিও।'

জুলেখা হাসল। তাকাল একবার কিশোরী আশমানির সহজ সরল মুখের দিকে। বলল, 'তোর অনেক গান শোনাবার ব্যবস্থা আমি করে দেব।'

সকলের খাটবার ক্ষমতা সমান নয়। মজবুত নয় গা গতর। মাঝে মাঝেই দু-চারজন অসুস্থ হয়ে পড়ছে। ডাক পড়ছে বুড়ো হেকিমের। হেকিমের দাওয়াই অব্যর্থ। তা দাওয়াই অব্যর্থ হলে কী হয়, কানা হেকিমের কাছ থেকে দাওয়াই আদায় করা কঠিন। এই পথ চলবার সময় আরো একটি অসুবিধা আছে। সেটি হল খাওয়া দাওয়া। হালুইকরেরা শুকনো খাবার তৈরি করে হাত গুটিয়ে বসে আছে। চিঁড়ে-গুড়, শুকনো খাবার, আর শুকনো কিছু ফল হল সাধারণের বরাদ্দ। এছাড়া আছে বাসি চাপাটি। বলবান লোকেদের পক্ষে এ খাবার বড়োই অপ্রতুল। পদাতিক বেশির ভাগ লোকই খিদের জ্বালায় হাঁ হাঁ করছে। কাছাকাছি গঞ্জ বা গ্রাম থাকলে এরা সেখানে ঢুকে পড়ে খাবার লুঠ করছে। গত তিন দিনের ভেতর বেশ কয়েকটি মেঠাইয়ের দোকান লুঠ হয়ে গেল।

হাতির পিঠে বসা হজরত হুসেন আলি খাঁয়ের ঠিক পিছনে একটি বিশাল সাদা ঘোড়ার পিঠে বসে আছে ইনায়েৎ মির্জা। মির্জা হলেন খাঁ সাহেবের সৈন্যাধ্যক্ষ। পরামর্শদাতা, বিশ্বস্ত অনুচর। হুসেন খাঁ যখন দক্ষিণদেশ পরিচালনার দায়িত্বে এলেন, তখন বিপুল ক্ষমতা নিয়েই এখানে এসেছিলেন। দক্ষিণের মুলুক শাসনের জন্য তিনি চেয়েছিলেন নিজের মনোমত কিছু

লোককে নিয়োগ করতে। সুবাদার, বকসি, ফৌজদার, কেল্লাদার নিয়োগের অধিকার ও বরখাস্ত করবার অধিকার তাঁকে স্বয়ং ফারুকশিয়াই দিয়েছিলেন। সে অধিকার আজো বহাল। এইসব পদে বিশ্বস্ত লোকদের নিয়োগের সময় তিনি খুঁজে পান ইনায়েৎ মির্জাকে। ইনায়েৎ কেবল বলশালী যোদ্ধা নয়, সে গুপ্তচরদের মাধ্যমে নিয়মিত প্রচুর খবর সংগ্রহ করে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, এসব খবরের বারো আনাই সত্যি।

ঔরঙ্গাবাদ থেকে দিল্লি পর্যন্ত যে সুদীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হবে, এ পথের নিখুঁত মানচিত্র রয়েছে ইনায়েত খাঁয়ের জেবের ভেতর। এই পথের ওপর পাঁচ ক্রোশ অন্তর অন্তর বসানো আছে চৌকি। এসব চৌকিতে যে-সব খবর সংগৃহীত হয়, সে খবর সরাসরি যাচ্ছে হুজুরের কাছে। এই বিশাল ও চলমান জনপদ চলছে ত চলছেই। মাঝে দু-একটি উট্‌কো অশ্বারোহী যুবক এই জনপদে এসে ঢুকে পড়ে। লোকগুলিকে বন্দী করে খাঁ সাহেবের কাছে আনা হয়। তাদের পরিচয়পত্র দাবি করা হয়। তাদের সাথে কোনও কোনও কাগজপত্তর থাকলে কেড়ে নেওয়া হয়। বিচার হয়। বিচারের পর হামেশাই এরা ছাড়া পেয়ে যায়। ওই উট্‌কো লোকগুলি কখনো শাস্তি পায় না। তারা আসে, থাকে এবং বাতাসে মিলিয়ে যায়। পরে এদের আর খোঁজ পাওয়া যায় না। ওই লোকগুলি হল গুপ্তচর। ইনায়েত মির্জার লোক।

ইনায়েত মির্জার ব্যবস্থায় হুসেন আলি খাঁ বেশ নিশ্চিন্তে আছেন। নিশ্চিত মনেই তিনি ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছেন তাঁর লক্ষ্যের দিকে। দিল্লির মসনদকে পরিণত করতে হবে সৈয়দের হুকুমদারিতে। নইলে শান্তি নেই। খাঁ সাহেব ইচ্ছে করলেই দক্ষিণ দেশের স্বাধীন সুলতান হিসাবে নিজেকে ঘোষণা করতে পারতেন। কিন্তু হুজুর হুসেন আলি খাঁয়ের খণ্ডাংশে লোভ নেই। ওঁরা দুই ভাই মিলে তামাম হিন্দুস্তানের দখলদারি চান। এই দখলদারি পাবার জন্য মারাঠাদের সঙ্গে চুক্তি হয়েছে তাঁর। রাজপুতদের সঙ্গেও সমঝোতা হয়েছে। দিল্লিতে বসে বড় ভাই হাসান আলি ওরফে আবদুল্লা খাঁ প্রশাসনকে নিজের হাতের মুঠোর ধরে রেখেছেন। এখন দরকার শুধু একটি ধাক্কার। এমন ধাক্কা, যাতে মসনদ থেকে ছিটকে পড়েন ফারুক শিয়ার। বেইমান ফারুক। ফারুকের মায়ের সেই আকৃতি আজো চোখের সামনে ভাসে। ফারুকের মেয়ের কান্নাকাটি আজো ভুলতে পারেন না খাঁ সাহেব। একটু যেন শীত করছে, তিনি চাদর টেনে নেন।

ফারুকের মায়ের কথা মনে হতেই হঠাৎ জুলেখা বাঈয়ের কথা মনে পড়ল। ফারুকের মায়ের চোখে মুখে যেমন এক বিষণ্ণতা ছিল, ঐ মেয়েটিরও মুখেও তেমনি এক বিষণ্ণভাব আছে। আপাতদৃষ্টিতে মেয়েটি সহজ। কিন্তু কোথায় যেন একটা গোলমাল আছে।

'ইনায়েৎ মির্জা।' হাওদার ওপর থেকে হাঁক দিলেন হুসেন আলি।
'জনাব।'
'চারদিকে তোমার নজরদারি ঠিক আছে।'
'আছে হজরত।'
'জুলেখা বেগম আমাদের হাতের মুঠোয় আছে তো?'
'আছে জনাব।'
'বিবিটার সম্পর্কে কিছু খবর পেলে?' হাসলেন খাঁ সাহেব, 'বাদশা ফারুকের গুপ্তচর নয় তো?'
'আজ্ঞে না। বরং ফারুকের ওপর তাঁর রাগটাই বেশি। সুযোগ পেলে বাদশা ফারুকের খুন নিতে ওর দ্বিধা নেই।'
'এত রাগ?'
'জি, এতখানিই রাগ।'
'তার নাচ দেখেও আপনি খুশিও হবেন জনাব। নাচের মজলিসে শাহাজাদাকেও রাখবেন।'
'সাবাস ইনায়েত মির্জা। তোমার কাজের আমি তারিফ করি।'
জঙ্গলের পাশ দিয়ে শাহী সড়কটি বেঁকে চলে গেছে তাপ্তি নদীর দিকে।
হাতির পিঠে বসে থাকতে থাকতে এবং ঐ নীল বনরেখার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কেমন যেন একটু ঝিমুনি এসেছিল খাঁ সাহেবের। হঠাৎ ঝাঁকুনি খেয়ে চট্‌কা ভেঙে গেল। ছোট্ট একটি খাল পার হল হাতিটি। চট্‌কা ভেঙে বনরাজির দিকে তাকাতে গিয়ে বহুদূরের শাহী সড়কে চোখ আটকে গেল খাঁ সাহেবের। তাঁর ভ্রূ যুগল কুঞ্চিত হল। দেখলেন, ধুলোর মেঘ উড়িয়ে এক অশ্বারোহী সৈনিক অতি দ্রুত এগিয়ে আসছে।
'মির্জা ইনায়েৎ।'
'এক ঘোড়সওয়ার যেন এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে।'
'ভয় নেই ও সওয়ার আমাদেরই নিশান উড়িয়ে এগিয়ে আসছে জনাব!'
খাঁ সাহেব দেখতে পেলেন নিশানটি। তবু নিশ্চিত হতে পারলেন না। ঘোড়সওয়ারটি কাছাকাছি আসতেই মির্জা এনায়েত এগিয়ে গেল। অশ্বারোহী যুবকটি একটি চিরকুট ধরিয়ে দিল মির্জা এনায়েতের হাতে। চিরকুটটি পেয়ে এনায়েতের মুখ কঠিন হল। শক্ত হল চোয়াল। হুজুর হুসেন আলি খাঁয়ের হাতির দিকে এগিয়ে এসে বলল, 'হুজুর! আপনার কাছে একটু পরামর্শ করবার দরকার আছে। যদি অনুমতি দেন, তা হলে আপনার হাওদার ওপর উঠি।'
অনুমতি মিলল। মাহুতের ইশারায় হাতি হাঁটু গেড়ে বসল মাটিতে। মির্জা

এনায়েত লাফিয়ে উঠে পড়ল হাওদার ওপর। হাওদায় উঠে হুজুরের পায়ের তলায় থপ্ করে বসে পড়ল।

'কী খবর, এনায়েৎ মির্জা।'

'খবর ভাল নয় জনাব। আমাদের গোপনদূত গোপনে সংবাদ সংগ্রহ করে এই চিরকুটটি পাঠিয়েছে। চিরকুটটিতে চোখ বুলোলেই সব খবর জানতে পারবেন। হুজুর, আপনি এই চিরকুটটি পড়ুন।'

খাঁ সাহেব পড়তে থাকলেন, 'খবর বড় ভয়ঙ্কর। বড় আতঙ্কজনক। দিল্লির বাদশাহ ফারুক শিয়ার বড়োই ক্ষীপ্ত হইয়া উঠিয়াছেন। তিনি সৈয়দ ভাইদের ওপর বেজায় চটিয়াছেন। তাঁহাদের ষড়যন্ত্র ধরিয়া ফেলিয়াছেন। হাসান আলি খাঁ ওরফে আবদুল্লা খাঁকে যাহাতে প্রাসাদে অবরুদ্ধ করা যায়, তাহার চেষ্টা চলিতেছে। প্রাসাদের হাবসি খোজা এবং তাতারবী রক্ষিণীরা ওৎ পাতিয়া বসিয়া থাকিবে। সুযোগ বুঝিলেই হাসান আলি খাঁয়ের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িবে। সৈয়দদের বড় ভাইকে এই ভাবে খতম করিবার ষড়যন্ত্র যেমন পাকা করিয়া ফেলা হইয়াছে অনুরূপ তৎপরতায় ছোটো ভাই হুসেন আলি খাঁকেও কোতল করা হইবে। সেজন্য নিশার খাঁকে দাক্ষিণাত্যে পাঠানো হইতেছে। তাঁহার সঙ্গে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার সৈনিক যাইতেছে। এ ছাড়া কামান-বন্দুক সহ গোলন্দাজ বাহিনী, পাঁচশত হাতি, বিশ হাজার ঘোড়সওয়ার এবং পাঁচ হাজার তীরন্দাজও বরশাধারী যাইবে। নিশার খাঁয়ের হাত শক্ত করিবার জন্য ইতিমাদ্দৌলা মহম্মদ আমিন খাঁকে সহযোগী করিয়া পাঠান হইতেছে। তিঁনি আগ্রা হইয়া অগ্রসর হইবেন এবং নর্মদার অপর পারে মারাঠাদের তাড়াইয়া দিবেন। হুসেন খাঁকে পরাজিত করিবার পর শাহজাদা জওয়ান বখ্‌তকে বাঁধিয়া লইয়া আসা হইবে। আগ্রার দুর্গপ্রাকার হইতে তাঁহাকে যমুনায় ফেলিয়া দেওয়া হইবে। বাদশা ফারুকশিয়ার কাহাকেও ক্ষমা করিবেন না। দিকে দিকে তিনি গুপ্তচর ছাড়িয়া দিয়াছেন। অতর্কিত আক্রমণে তিনি শত্রুদের প্রতিহত করিবেন। জনাব হুসেন আলি খাঁয়ের কাছে এই খবর এখনই পৌছাইয়া যায়। ইতি হুজুরের চরণাশ্রিত বিশ্বস্ত বান্দা সবুর খাঁ।'

একবার নয়। বারবার এই চিঠিটি পড়লেন হুসেন আলি খাঁ। যতবার পড়লেন, ততবারই তাঁর চোয়াল শক্ত হল। আগুনের ভাঁটার মতন চোখ দুটি তাঁর ধক্ ধক্ করে উঠল। ছড়ানো আঙুলগুলিকে বার কয়েক মুঠো করলেন। শেষে ফ্যাঁস ফেসে গলায় বললেন, 'এই সবুর খাঁ কে ? নিজেকে আমার বান্দা বলে পরিচয় দিয়েছে দেখছি। আমি চিনি না। ইনায়েত তুমি একে চেনো ?'

'চিনি না। চাক্ষুষও কোনদিন তাকে করিনি। তবে আমাদের এই গুপ্তচর দিল্লি থেকে নিয়মিত খবর পাঠায়। আমরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নি।'

'সবুর খাঁয়ের এই পাঠানো খবরের ভিত্তিতে এখন কী ব্যবস্থা নেবে ? দেড় লাখ সৈন্য এলে আমরা পারব কী করে ?

'কেবল দেড় লাখ নয় জনাব। দেড় লাখের বাইরে আছে গোলোন্দাজ

বাহিনী। আছে তীরন্দাজ আর বরশাধারীগণ। তাদেরও মোকাবিলা করতে হবে।'

জানো নিশার খাঁ তাঁর ঐ বিপুল সৈন্যবাহিনী নিয়ে এখন কোথায়?'

'ঠিক বুঝতে পারছি না জনাব। তবে খবরটা ধরে বিচার করলে, এখনও নর্মদার ওপারে ওঁরা এসে পৌছুননি।'

'তা হলে বুরহানপুর পর্যন্ত এগিয়ে যাওয়া যাক। তাপ্তি নদীর ওপারে একটি কেল্লা আছে। পুরনো কেল্লা। সেখানে গিয়ে ঢুকে পড়তে হবে। পহেলা লড়াইটা সেখানেই হবে। তারপর যা করবার, বুঝেসুঝে করা যাবে।'

'হজরতের যেমন ইচ্ছা।'

'ইতিমধ্যে তোমাকে তিনটি কাজ করতে হবে।'

'কী কাজ জনাব?'

'তোমাকে গোপনে মারাঠাবাহিনীর কাছে এ খবর পৌছে দিতে হবে। বালাজি ভাট যেন এখবর পান। কেন না, তাঁরও তৈরি হয়ে থাকা দরকার। তোমার দ্বিতীয় কাজটি হল শাহাজাদা জওয়ান বখ্‌তকে সুরক্ষিত করা। তার হাতে একটা ফিরিঙ্গি পিস্তল ধরিয়ে দেবে। আর দেখিয়ে দেবে, কীভাবে পিস্তল ছুঁড়তে হয়। দরকার হলে, নিজের নিরাপত্তা সে নিজেই নিতে পারবে। আর তিসরা কাম হল বান্দা সবুর খাঁয়ের পাঠানো এই খবর যেন কেউ জানতে না পারে। সাবধান। আমাদের সৈন্যবাহিনীতে তুমি-আমি ছাড়া এ খবর আর কেউ যেন টের না পায়।'

'তাই হবে জনাব!'

বিশাল সৈন্যবাহিনী, লোক-লস্কর, হাতি ঘোড়া, মিঞা-বিবি যে যেমন চলছিল, সেইভাবেই চলতে থাকল। আসন্ন বিপদের কোনও ছায়া তাদের চোখে মুখে দেখা গেল না। আরও দিন তিনেক হাঁটবার পর এই বিশাল বাহিনী এসে পৌছুল তাপ্তিনদীর ধারে। তাপ্তি খুব বহতা নদী নয়। গ্রীষ্মকালে বিস্তৃত বালুশয্যার ওপরে শীর্ণ ধারায় প্রবাহিত হয়। বর্ষার পরে এ নদী কিঞ্চিৎ স্ফীত। তরঙ্গ সঙ্কুল। তবে দুরতিক্রম্য নয়। সৈয়দ হুসেন খাঁ তাঁর বিশাল বাহিনী নিয়ে এ নদী সহজেই পার হলেন। অদূরে প্রাচীন দুর্গ। সেই দুর্গে আশ্রয় নিলেন। সামনের প্রান্তরে ছাউনি পড়ল সৈন্যবাহিনীর। দুর্গ প্রাকার থেকে নজর রাখা হতে থাকল উত্তরের শাহী সড়কের দিকে।

খাঁ সাহেবের সৈন্যবাহিনী নদীর ওপারে ঠাঁই নিলেও মারাঠাবাহিনী কিন্তু নদী অতিক্রম করল না। তারা তাপ্তি নদীর এপারে অরণ্যসঙ্কুল একটি অনুচ্চ পাহাড়ের গায়ে তাঁবু ফেলল। খাঁ সাহেবের সৈন্যদের থেকে বরাবরই কিছু দূরে অবস্থান করছে। এবারেও তার ব্যতিক্রম হল না। মারাঠা বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা অনধিক পনেরো হাজার। এই পনেরো হাজারের ভেতর বারো হাজার হল অশ্বারোহী। এই অশ্বারোহী সৈন্যরা পাহাড়ি যুদ্ধে পটু। দ্রুত

আঘাত হানা এবং তার থেকে দ্রুত পালিয়ে যাওয়াতে এরা নিপুণ। মারাঠাদের এই যুদ্ধ কৌশলে মুঘলরা এঁটে উঠতে পারে না।

একবার ছাউনি পড়লে দিন পাঁচ-সাতের আগে সে ছাউনি আর ওঠে না। সকলেই জানেন যে পথের ক্লান্তি দূর করার জন্য এ ব্যবস্থা। আসলে যুদ্ধযাত্রার এটি একটি কৌশল। পথ চলতে চলতে আসন্ন যুদ্ধের কৌশল ঠিক করা হয় এই যাত্রার বিরতিতে। বিপক্ষ বাহিনীর খবর সংগ্রহ করা হয়। এবং প্রয়োজনমত নিজেদের ভেতরে আত্মশক্তির আবেগ জাগিয়ে তোলা হয়। মারাঠী সেনাপতিরা এই বিরতির পূর্ণ সুযোগ নিয়ে থাকেন।

তবে এইভাবে সেনাদের নিয়ে রাজা শাহু এবং পেশোয়া বালাজী ভট্টের দিল্লি যাত্রা মারাঠাদের ইতিহাসে রীতিমত নতুন। মারাঠারা চিরকাল পাহাড়ে আর জঙ্গলে লড়াই করেছে। লড়াই করেছে নিজেদের ভূখণ্ডে। পরিচিত জায়গায়। এ ভাবে ফৌজ সাজিয়ে তালে তালে পা ফেলে হাঁটতে হাঁটতে কখনও তাঁরা দূর দেশে যুদ্ধ যাত্রা করেনি। তাই এই যাত্রায় রাজা শাহু, সেনাপতি ধনাজী যাদব এবং ভট্ট বালাজী সকলের মনেই ধন্দ। সংশয়। তবে কেউই পিছু হঠতে রাজি নন।

প্রায় পাহাড়ের শিখরে, অপ্রশস্ত এক সমতল ভূমিতে তাঁবু পড়েছে রাজা শাহুর। শিবিরে তাঁর কক্ষে নিশীথ রাতে একটি মন্ত্রণাসভা বসল। এ সভায় পাহারাদার ছাড়া মাত্র চারজন ব্যক্তি হাজির। মহারাজ শাহু এবং ভট্ট বালাজী ছাড়া আরও দু'জন ব্যক্তি হলেন হনুমন্ত রাও এবং রাজু ঘোড়পাড়ে। দু'জনেই হলেন তরুণ সৈন্যাধ্যক্ষ। ধনাজী আসেননি। বিশ্রাম নিচ্ছেন।

শাহুজী তাঁর সহজ সরল ভঙ্গিতে বললেন, 'আমরা যে ভাবে এগিয়ে চলেছি, তা বড়ই অনিশ্চিত। আমরা শেষপর্যন্ত দিল্লিতে পৌঁছুতে পারব?'

'না পারার কী আছে?'

দিল্লি আমাদের একান্ত অপরিচিত জায়গা। তখ্ত দখলের পর যদি হুসেন আলি ঘুরে দাঁড়ায়? তখন পালিয়ে আসবার পথ খুঁজে পাব তো?'

'আমরা কারোকেই বিশ্বাস করি না শাহুজী! রাজনীতির পহেলা পাঠ হল প্রতিপক্ষ শক্তিকে কখনও বিশ্বাস না-করা! হুসেন আলি খাঁ এই মুহূর্তে আমাদের বন্ধু। মিত্র। তবু হুসেন আলি খাঁকে আমরা পুরোপুরি বিশবাস করি না। ওঁদের থেকে তাই সর্বদা দূরে দূরে থাকি। কিন্তু খাঁ সাহেব আমাদের নজরদারির বাইরে নয়।'

'সাবাস্।' উচ্ছ্বাসে শাহুজীর চোখ দুটি জ্বল্ জ্বল্ করে উঠল। এরপর নিচুগলায় ফিস্ ফিস্ করে বললেন, 'হুসেন আলি খাঁয়ের গুপ্তচরেরা খবর এনেছে, নিশার খাঁ নাকি দিল্লি থেকে দেড় লাখ সৈন্য নিয়ে এগিয়ে আসছেন। উনি এসে কোতল করবেন খাঁ সাহেবকে।'

রাজু ঘোড়পাড়ে এবং হনুমন্ত রাও একসঙ্গে বলে উঠলেন, 'আমরা জান কবুল করে লড়ব। ভয়ে পিছিয়ে যাব না।'

'সৈন্যাধ্যক্ষরা ঠিকই বলেছেন। তাঁদের পদের উপযোগী কথাই তাঁরা বলেছেন।' গম্ভীর ভাবে বললেন ভট্ট বালাজী। সেই ধাতব কণ্ঠস্বরটা শোনা গেল, 'হুজুর শাহুজী শুধু নিশার খাঁয়ের অভিযানের কথা বললেন, মারাঠা শক্তিকে মুছে ফেলাও হল বাদশা ফারুকশিয়ারের নির্দেশ। সেই হুকুম তালিম করতে এগিয়ে আসছেন আমিন খাঁও। এই ভয়ঙ্কর আসন্ন বিপদের কথাটাও আমাদের খেয়াল রাখতে হবে।'

ঘোড়পাড়ে বলল, 'এ বিপদ আমরা কী ভাবে মোকাবিলা করব?'

'কেন, লড়াই করে?'

'ঐ দেড়লাখ সেনার সঙ্গে সামনা সামনি লড়াই করে আমরা কী পারবো?'

ঘোড়পাড়ের কথায় হেসে ফেললেন ভট্ট বালাজি। বললেন 'এ লড়াই হবে না। খবরটা ডাহা মিথ্যা। ধোঁকাবাজি।' বালাজীর কথায় স্বয়ং শাহুজী চমকে উঠলেন। 'ডাহা মিথ্যা?' ধোঁকাবাজী? কে ধোঁকা দিল? কাকে?

আবার হাঁড়ির ভেতর থেকে কথা বেরিয়ে এল, 'এ ধোঁকা আমিই দিয়েছি। সবুর খাঁর নামে। নিশার খাঁর নাম শুনিয়ে হুসেন আলি খাঁয়ের মনে ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছি। বিপদে পড়লে মানুষ একখণ্ড তৃণকেও আঁকড়ে ধরে। খাঁ সাহেব আমাকে আরও নিবিড় করে পেতে চাইছেন। দূত পাঠিয়েছেন, নিসার খাঁর খবরও পাঠিয়েছেন।'

'নিসার খাঁর খবর তা হলে সত্যি নয়?'

'সবটা সত্যি নয়। তবে একেবারে ডাহা মিথ্যে নয়। নিসার খাঁ নামে এক সুবাদার সত্যিসত্যিই দাক্ষিণাত্যে আসছেন। তাঁর তাঁবে দেড়-দু হাজার সেনা আছে, এই পর্যন্ত।'

'হুসেন খাঁ যখন এই খবরটা জানতে পাবেন, তখন কী হবে?'

'তখন তাঁর সেনাপতি এনায়েৎ খাঁ ধমক খাবে। আর দু'একটি গুপ্তচরের মাথা যাবে। এর বেশি নয়।'

'আমরা যাঁকে 'শাহাজাদা' বলে দিল্লি নিয়ে চলেছি, তাঁর কিছু হবে নাতো?'

'এখন কিছু হবে না তাঁর। তবে শেষপর্যন্ত জোয়ান্ বখ্‌ত তখ্‌তে বসতে পারবেন কি-না তা নিয়ে ঘোর সংশয় আছে।'

'এমন সংশয়ের কারণ?'

'কারণ একটাই তিনি নিজের বাপের নাম 'বাদশাজাদা আকবর' না-বলে, বলে বসছেন ইব্রাহিম খাঁ।'

'শাহজাদা' সাজতে গিয়ে ছেলেটা পাগল হয়ে যাবে?'

'না, পাগল হতে আমরা তাঁকে দেব না। তাঁর কাছে আমাদের গুপ্তচর

মাঝে মাঝেই যায়।' গম্ভীর গলায় বললেন ভট্ট বালাজী। 'এখন রোজ যাবে। রোজ।'

এদিকে তাপ্তি নদীর তীরে পুরনো দুর্গের ভেতর আশ্রয় নেবার পর থেকে সকলের সঙ্গে যোগাযোগটা কেমন যেন এলোমেলো হয়ে গেল। দুর্গের অনেক ঘরে ধুলোর পর ধুলো জমেছে। বাসা হয়েছে চামচিকির। গন্ধে ঘরের ভেতর টেকা যায় না। পাথরের দেওয়ালে চারদিকে ফাটল। কোনও কোনও দেওয়ালের গা বয়ে নেমেছে বর্ষার জলধারা। গাছ-গাছালির শেকড়। অলিন্দে, চত্বরে, পাথর বসে গেছে। কিংবা হঠাৎ জেগে উঠেছে। হাঁটতে গেলে হোঁচট খেতে হয়। কক্ষের বাতায়নগুলি অবাধ। তাপ্তি নদীর উত্তুরে বাতাস হু হু করে ভেতরে ঢুকে আসছে।

ঝাড়ুদাররা যথাসম্ভব সাফ করে ফেলল দুর্গের অভ্যন্তর। ফরাসরা সাজিয়ে ফেলল কক্ষগুলি। আলাদা হল জেনানা মহল। ভারি ভারি কোমল গালিচা পেতে দেওয়া হল ঘরের মেঝেতে। ছড়িয়ে দেওয়া আতর। তবু চামচিকার গন্ধ যায় না। বিবি আর বাঁদিরা নাকে রুমাল দিয়ে ঘোরে। আর দেওয়ালে আরশোলা দেখে আঁতকে ওঠে।

জুলেখা সে রাতে আশমানিকে নিয়ে একটি ঘরে ঠাঁই পেল। কিন্তু উত্তরদিকের দেওয়ালে বিরাট এক ফাটল। সে ফাটল সারারাত হাওয়া টানল। তাপ্তি নদীর ওপর দিয়ে প্রবাহিত শীতল বাতাস অবাধে চলে এল। আশমানির অবশ্য কিছু হল না। কিন্তু ধুলোয় ও হাওয়ায় পরের দিন থেকে জুলেখা বিবির জ্বর হল। ধুম জ্বর।

এই জ্বরের জন্য ডাক পড়ল হেকিম সাহেবের। ডাক পড়ল মিশিরলালের। জেনানা মহলে পুরুষদের ঢোকা নিষিদ্ধ। চোখে কাপড় বেঁধে গায়ে বোরখা চড়িয়ে মহলরক্ষী তাতারদের হাত ধরে ঢুকতে হয়। মিশিরলাল সেই ভাবেই নিয়মিত জুলেখা বিবির কাছে যাতায়াত করতে থাকল। কখনো একা, কখনো হেকিমকে নিয়ে। দিন পাঁচ-সাত পরে জুলেখা খানিক সুস্থ হল।

একদিন অপরাহ্ন বেলা। সবে সূর্যাস্ত হয়েছে। পশ্চিম আকাশ ঘোর রক্তবর্ণ। পাটল রঙের আভা এসে পড়েছে বিছানার ওপর। কোমল মখমলের তাকিয়ায় ঠেসান দিয়ে পশ্চিমের আকাশের দিকে তাকিয়ে জুলেখা বিবি চোখ বুজে শুয়েছিল। অসুস্থ দুর্বল শরীর। অপরাহ্নের লাল আভায় বিবিকে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিল।

'বিবিজান।' ঘরের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে মিশিরলাল। শাহাজাদার সঙ্গে নিরিবিলিতে তোমার দেখা করিয়ে দেব বলেছিলাম, সেই দেখা এখনই হতে পারে। নদীর ধারে শাহাজাদা বসে আছেন কেল্লার ঘাটে। একা। গেলে দেখা হয়ে যাবে।

শাহাজাদার সঙ্গে দেখা হবে? একান্তে? জুলেখার ভেতর যেন প্রবল তুফান উঠল। জুলেখা ভুলে গেল তার অসুস্থতার কথা। বোরখাটা গায়ে চাপিয়ে নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল মিশিরলালের সঙ্গে। মিশিরলালের গায়েও কালো কুর্তা। জেনানা মহলের তাতার রক্ষিণীরা তাকে প্রশ্ন করল না। জুলেখা বিবিকে তারা চিনতে পারল না। মিশিরলালকে অনুসরণ করে মেলা চত্বর, প্রাঙ্গণ, এবং বিস্তর ওঠা-নামা করে তারা এসে পৌঁছুল কেল্লার একটি ভগ্ন জীর্ণ ঘাটে। পাথরের সোপান ধীরে ধীরে নেমে গেছে তাপ্তি নদীতে। আসন্ন সন্ধ্যায় তাপ্তির জল নিবিড় কালো হয়ে উঠেছে। জলের ধারে একটি সোপানের ওপর সত্যি সত্যিই বসে রয়েছেন শাহাজাদা!

'জোয়ান বখ্ত, ভাই! তুমি কী আমাকে চিনতে পারছ?' কালো বোরখাটা খুলে পাশে রাখল জুলেখা বিবি। 'আমি তোমার দিদি আনারকলি।'

এইরকম এক নিঃসঙ্গ নির্জন পরিবেশে কামানের গোলা পড়লেও বোধহয় এতখানি চম্‌কে উঠত না জোয়ান বখ্ত। জোয়ান বখ্ত ভীষণ চম্‌কে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল পাথরের সোপানের ওপর। তার গলার স্বর কেঁপে উঠল। কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, 'সত্যিই তুমি আমার দিদি। সেই হারিয়ে যাওয়া দিদি? তুমি কী করে আমাকে চিনলে? কেমন করে?' তীব্র ব্যাকুলতায় কেঁপে উঠল জোয়ান বখ্তের কণ্ঠস্বর।

পরক্ষণেই তীব্র কর্কশ কণ্ঠে সে বলে উঠল, 'মিথ্যে কথা? ছলনা। আনারকলির নাম নিয়ে তুমি আমার সঙ্গে ছলনা করতে এসেছ! তুমি খাঁ সাহেবের পাঠানো গুপ্তচর!'

'না, জোয়ান বখ্ত, না! তুই আমার ভাই! ইব্রাহিম খাঁ হলেন আমাদের বাপ! তুই সব ভুলে গেলি?'

'মিথ্যে কথা। সাজানো কথা। ইব্রাহিম খাঁ আমার বাপ নন। আমার বাবা হলেন বাদশাজাদা আকবর। আমি দিল্লি চলেছি তখ্ত দখল করতে।'

কথা বলতে বলতে শাহাজাদা ওরফে জোয়ান বখ্ত চারদিকে তাকাতে থাকলেন। চারদিক জুড়ে আঁধার নামছে নিবিড় হয়ে। বাতাসে সোঁ সোঁ শব্দ। নিচে তাপ্তির জলকল্লোল। বখ্তের মাথায় কি পাগল ভর করল? সে হা-হা করে হাসতে হাসতে ফিরিঙ্গি পিস্তলটা বের করে অন্ধকারে আচমকা গুলি ছুড়ল।

তার এই গুলি বৃথা গেল না। অন্ধকারের বুকে শোনা গেল ক্ষীণ একটি আর্তনাদ। একটি লোক গড়িয়ে পড়ল নদীর জলে। মিশিরলাল আর জুলেখা ফিরে এল নিজেদের আস্তানায়।

॥ আট ॥

দোজখ্ থেকে মুক্তি

রাত ধীরে ধীরে নিশুতি হচ্ছে। পথঘাট নির্জন। মানুষের গলার স্বর আর তেমন শোনা যায় না। কৃষ্ণপক্ষের চতুর্থী কিংবা পঞ্চমী। দিল্লির আশমানে একফালি চাঁদ। বেনিয়া রতনচাঁদ একমনে তাঁর দৈনন্দিন কেনা-বেচার হিসাব কষছে। দোকানের কর্মচারীরা অনেকক্ষণ চলে গেছে নিজের নিজের কুঠিতে। বন্ধ হয়ে গেছে মহল্লার সব দোকান-পাট। রতনচাঁদও এখনই তার দোকান বন্ধ করবে।

বাইরে হা-হা করছে নির্জন পথ। মাঝে মাঝে দু'একটি কুকুরের ডাক ভেসে আসে নৈশ বাতাসে। মহল্লার মোড়ে এক পাগল চিৎকার করছে। দূর রাজপথ থেকে কখনও কখনও ভেসে আসে ছুটে চলে-যাওয়া ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ। এসব কোনও দিকেই খেয়াল নেই বেনিয়া রতনচাঁদের। চেরাগের মৃদু আলোয় সে হিসাব কষে দেখল, ঐ দিন তার মোট লাভ হয়েছে চার টাকা সাত আনা তিন পাই। হিসেবে লাভের অঙ্কা দেখে খুশি রতনচাঁদ বেনিয়া। খাগের কলম সরিয়ে রাখেন।

আর ঠিক সেই সময়েই তার চোখ আটকে গেল দোকানের একপাটি-খোলা দরজার দিকে।

রতনচাঁদ দেখল, দীর্ঘকায় এক ব্যক্তি নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে দরজার সামনে। মুখে দাড়ির জঙ্গল। হাতে একটি লাঠি। লোকটির চোখ জোড়া আগুনের ভাঁটার মতন দপ্ দপ্ করে জ্বলছে। রতন বেশ ভয় পেল।

'কী রতনচাঁদ। ভয় খেয়ে গেলে? এই মুহাজির মুসলমানটাকে চিনতে পারলে না?'

'ন্‌না' ভয়ে গলা কাঠ।

কাবা-পরা দীর্ঘদেহী মানুষটি হা-হা করে হেসে উঠে বললেন,'আমার নাম ইব্রাহিম খাঁ। এই মহল্লাতেই আমি থাকতাম একসময়।'

রতনচাঁদ লাফিয়ে উঠল তার 'গদি' থেকে। উত্তেজনা আর আনন্দে চিৎকার করে উঠল, 'চিন্‌তে পেরেছি খাঁ সাহেব। চিনতে পেরেছি। হুজুর কোথায় যাবেন?'

'না। এখনই কোথায় যাব না। সুদূর দক্ষিণ দেশ থেকে আমি আসছি। এক হাজার ক্রোশ পথ অতিক্রম করে এই মাত্র আমি দিল্লি এসে পৌঁছুলাম। দিল্লি শহরে আমার অনেক পরিচিত জন আছে বটে, কিন্তু থাকার মতন আস্তানা নেই। অনেক ভেবেচিন্তে শেষে তোমার কাছেই এসে উঠলাম। ঠাঁই দেবে কিনা ভেবে দেখো।'

'ভেবে দেখব? হা-কপাল। ভেতরে চলে আসুন জনাব।—আমার এই দোকানের লাগোয়া ভিন্ মুলুকের ব্যবসায়ী মুসলমানদের থাকবার তোফা ব্যবস্থা আছে। মুসাফিরখানার থেকে অনেক ভাল। যতদিন খুশি আপনি আমার অতিথি হয়ে থাকুন।'

ইব্রাহিম খাঁ ভেতরে ঢুকে এলেন। একটি কুরশি টেনে নিয়ে বসলেন। বললেন, 'আল্লাহ্ তোমার মঙ্গল করুন রতনচাঁদ। আমি বড় ক্লান্ত। আমাকে আশ্রয় দিয়ে তুমি বড় উপকার করলে। বাকি জীবনটা এখন মক্কায় কাটাব। শেষবারের মতো দিল্লি শহরটা দেখে হিন্দুস্তান ছেড়ে চলে যেতে চাই।'

রতনচাঁদ ভয়ে ভয়ে বলল, 'জনাব, আপনাকে তো দেখছি, জোয়ান বখ্ত কোথায়?'

'জানি না। হয়তো সে জঙ্গলে বাঘের পেটেই গেছে।' বিষণ্ণ হাসি হাসলেন ইব্রাহিম খাঁ। 'একদিন পৃথিবীতে আমি একা ছিলাম। আজ আবার কেমন একা হয়ে গেছি!'

'হুজুর। এবার খানা খেয়ে শুয়ে পড়ুন। আপনার সঙ্গে লটবহর কিছু নেই।'

'ন্‌না। আমার যা কিছু সঞ্চয়, তা এই কাঁধের ঝুলিতেই আছে। পোশাক পর্যন্ত। আমার এমনকি ঘোড়াও নেই। দক্ষিণ দেশ থেকে পয়দালেই চলে এসেছি। একটু গরম জলের ব্যবস্থা করে দাও। পায়ে বড় ব্যথা।'

তিনদিন তিনরাত্তির বিশ্রামের পর ইব্রাহিম খাঁ পায়ে হেঁটে রওনা দিলেন কেল্লার দিকে।

কেল্লার দিকে যাবার একটা উদ্দেশ্য ছিল। সেই উদ্দেশ্যটি হল, 'কাজী-উল-কাজাতে'র সঙ্গে একবার দেখা করা। 'কাজী-উল-কাজাতে'র কাছে তিনি ন্যায় বিচার দাবি করেছিলেন। কিন্তু কোনও বিচারই পাননি। আজও সেজন্য বুকের ভেতর লুকিয়ে রয়েছে দুর্বার অভিমান। অভিমান সত্ত্বেও কাজী-উল-কাজাতকে শ্রদ্ধা করেন খাঁ সাহেব। তাই আসা।

পথের ধারে একটি পানশালা। এই ধরনের পানশালায় সাধারণত শরাব বিক্রি হয়। তবে সরবৎও পাওয়া যায়। খাঁ সাহেব সরবৎ পান করবার জন্য দাঁড়ালেন। পানশালার ভেতরে বাইরে বেশ ভিড়। ছোটো চৌকি, দড়ির খাটিয়া আর কুরশির ওপর একদঙ্গল নেশাড়ু বসে আছে। খাঁ-সাহেবকে ভেতরে ঢুকতে দেখে একজন কুরশি থেকে উঠে দাঁড়াল।

'খাঁ সাহেব যে। সেলামালেকুম। অনেককাল আপনাকে দেখিনি। আপনি এই শহরে ছিলেন না!'

'না। আমি প্রায় একযুগ ছিলাম না।'

'তাহলে শুনুন। দিল্লিতে এবার মজাদার খেলা আরম্ভ হবে খাঁ সাহেব।' লোকটি হাসতে হাসতে বলল। 'এখন এই সকালে কোথায় চললেন?'

'যাব কেল্লার দিকে। শাহী সেরেস্তায় আমার একটু দরকার আছে।'

'শাহী সেরেস্তা?' পাশের থেকে আরেকটি লোক বলে উঠল, 'ওদিকে আর পা বাড়াবেন না খাঁ সাহেব। কেল্লার ধারে কাছে যাবেন না। কদিন ধরে ওখানে এলোমেলো ধরপাকড় চলছে। সন্দেহজনক অচেনা লোক দেখলেই পাহারাদাররা শাহী ফাটকে ঢুকিয়ে দিচ্ছে।'

'ফারুকশিয়ার বুঝি এসব কাণ্ড করছেন?'

'ফারুকশিয়ার? তেনার হাত ঠুঁটো হয়ে গেছে খাঁ সাহেব। বকলমে কাজ চালাচ্ছেন সৈয়দ আবদুল্লা খাঁ। তিনি বাদশাকে প্রায় বন্দি করে রেখেছেন।'

'মুঘল বাদশা কেল্লার ভেতর বন্দি হয়ে গেছেন? সৈয়দ আবদুল্লা বাদশা হবেন না কি?' বিস্ময়ে ফেটে পড়লেন ইব্রাহিম খাঁ।

'আবদুল্লা খাঁ বাদশা হতে চান না। নতুন এক শাহাজাদা আসছেন দক্ষিণ দেশ থেকে। সঙ্গে আসছে বিশাল সৈন্যবাহিনী। দিল্লি এসে পৌঁছুলে তিনিই হবেন বাদশা।'

'বটে। তা তোমরা এখবর পেলে কোথায়?'

'এ সব খবর এখন দিল্লির বাতাসে উড়ে বেড়াচ্ছে। কান পাতলেই শুনতে পাবেন।'

সরবতের পানপাত্রটি ঠক্ করে নামিয়ে রেখে এবং দোকানিকে পয়সা-কড়ি মিটিয়ে দিয়ে খাঁ সাহেব আবার পা ফেললেন সড়কে। রাজধানীর লোকদের দীর্ঘকাল চেনেন তিনি। এরা বরাবরই হুজুগে। তিলকে তাল করে ছাড়ে। তা ছাড়া কেচ্ছা পছন্দ করে।

কিন্তু কেল্লার পথে যতই তিনি এগিয়ে চলেন, ততই রাহী লোকদের তিনি কম দেখতে থাকলেন। চারদিক কেমন যেন শুন্‌শান। প্রাসাদের অলিন্দ ও বাতায়ন রুদ্ধ। রাজপথের এমন চেহারা ইব্রাহিম খাঁ কখনও দেখেননি।

নির্জন পথকে সচকিত করে হঠাৎ একদল অশ্বারোহী দৌড়ে বেরিয়ে এল কেল্লার দিক থেকে। তাদের ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দে মুখরিত হয়ে উঠল রাজপথ। ঐ অশ্বারোহীর দল পথ কাঁপিয়ে বিদ্যুৎবেগে চলে গেল নগরের ভেতরের দিকে। তারা চোখের আড়ালে যেতে-না-যেতে এসে গেল আরেকদল অশ্বারোহী। এরা এল অজস্র তীর ছুঁড়তে ছুঁড়তে। ওদের তাড়া করে। উড়ন্ত তীরের হাত থেকে বাঁচবার জন্য পথচারীরা নানা দিকে ছিটকে পড়ল। কেউ কেউ শুয়ে পড়ল রাস্তার ওপর।

খাঁ সাহেব পথ থেকে সরে গিয়ে ঢুকে পড়লেন পাশের এক ইমারতের চত্বরে।

চত্বরে ঢুকতেই দৌড়ে এল এক খোজা পাহারাদার। বীভৎস তার

চেহারা। নিকষ কালো রং। খাঁ সাহেব কিছু বলবার আগেই সে ছোঁ মেরে তাঁকে তুলে নিয়ে গেল ভেতরে। ইমারতের ভেতরের কক্ষে। সেখানে দু'জন লোক বসেছিলেন। তাঁদের চোখে-মুখে ভয়ের ছাপ।

'কে আপনি? আমাদের ইমরাতে ঢুকেছেন কিসের ধান্ধায়?' একজন তাঁকে জিগ্যেস করল কাঁপা-কাঁপা গলায়।

'আমি কাজী ইব্রাহিম খাঁ। আমি শাহী সেরেস্তায় যাচ্ছিলাম 'কাজী-উল-কাজাতে'র সঙ্গে দেখা করতে।'

'আশ্চর্য! এই সময় আপনি যাচ্ছেন কাজাতের সঙ্গে দেখা করতে?'

'কেন? এখন তাঁর দেখা পাওয়া যাবে না?'

অন্য লোকটি বিরক্ত হয়ে বলল, 'কী মুশকিল, ভেতরে যাবেন কী করে? বাদশা ফারুকশিয়ারের লোকেদের সঙ্গে উজির আবদুল্লা খাঁয়ের লোকেদের মারামারি চলেছে। রাস্তার ওপর বিস্তর লোক খুন হয়ে যাচ্ছে। এর ভেতর নতুন শাহাজাদা যদি এসে পড়েন, তা হলে কথাই নেই। তখন খুনে লাল হয়ে যাবে শহর দিল্লি।'

ইমারতের ভেতর কথা বলবার সময় পথের ওপর আবার ঘোড়া ছোটার শব্দ শোনা গেল।

ইমারতের আশ্রয় থেকে বেরিয়ে এসে ইব্রাহিম গলির পথ ধরলেন। সে পথ ধরেও সুবিধা করতে পারলেন না। অবশেষে হতাশ ও ক্লান্ত হয়ে খাঁ সাহেব ফিরে এলেন বেনিয়া রতনচাঁদের ডেরায়। এসেই শুয়ে পড়লেন বিছানায়। মনে মনে বিড় বিড় করতে থাকলেন, 'হা-আল্লাহ্! এ দোজখ্ থেকে সকলকে তুমি মুক্ত করো।'

সন্ধ্যার কিছু পরে বেনিয়া রতনচাঁদ এল খাঁ সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে।

'রতনচাঁদ।'

'জি।'

'রাজধানী দিল্লির যে এমন হাল হয়েছে, তা তুমি বলো নি তো!'

মাথা চুলকোতে থাকল রতনচাঁদ। চুলকোতে চুলকোতে বলল, 'হুজুর! এ হাল তো অনেকদিন ধরেই চলছে। হিন্দুস্তানের সব লোকই জানে। আমি ভেবেছিলাম, আপনিও জানেন। আপনি কোনও গোলমালের ভেতর পড়ে গিয়েছিলেন?'

'না। তবে বিরাট একটা গোলমাল যে আসছে, তা কেল্লার কাছাকাছি গিয়ে টের পেলাম। কেউ বলছে বাদশা ফারুকশিয়ার বন্দি হয়ে গেছে বরা আবদুল্লা খাঁয়ের হাতে। আবার কেউ বলছে এখনও লড়াই চলছে।'

এবার রতন গলা সাফ করে বলে উঠল, দক্ষিণ থেকে শাহাজাদাকে আনা হচ্ছে। আনছেন বরা সৈয়দের ছোটো ভাই হুসেন আলি খাঁ। লোকটি যেমন

জেদী, তেমনি বদমেজাজী। মায়া মমতা বলে তাঁর শরীরে কিছু নেই। তাঁর নিজের সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে নিয়ে আসছেন মারাঠাদের। উজীর বালাজী ভাট তাঁর পাহাড়ি ফৌজ নিয়ে আসছেন রাজধানী লুঠ করতে। রাজা শাহু আসছেন তাঁর মা-ভাইবোনদের মুঘল অবরোধ থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যেতে। যাবার সময় চুক্তি-মোতাবেক সৈয়দ ভাইদের কাছ থেকে নিয়ে যাবেন লাখ লাখ তঙ্কা আর মণিমুক্তো।'

'মারাঠাদের পাহাড়ি ফৌজ এখন কোথায়?'

'দিল্লির দরজায়। শহরের সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে লুঠতরাজ শুরু হয়ে গেছে। দু'একদিনের ভেতরেই শহরের ভেতরে ঢুকে পড়বে। রাজা শাহু তাঁবু খাটিয়ে বসে আছেন যমুনার ওপারে। বালাজী ভাট রয়েছেন এপারে। শুনছি, হাতির পিঠে চড়ে শাহাজাদা আর হুসেন আলি খাঁ কেল্লায় ঢুকবেন লাহোর ফটক দিয়ে। ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের সম্বর্ধনায় তোপ ফুটবে।'

কিন্তু কাজীর সঙ্গে দেখা না-করে মক্কা যাই কেমন করে?'

'আপনার মক্কা যাবার সঙ্গে তেনার কী সম্পর্ক?'

'তাঁর সেরেস্তায় আমার পারিশ্রমিকের প্রচুর টাকা জমা পড়ে আছে। আমার মেহনতির বেতন। সে বেতনই হবে আমার বাকি জীবনের সম্বল। তাই সেটুকু আমাকে উদ্ধার করতেই হবে।'

এবার অনেক ভেবেচিন্তে রতন বলল, 'যদি সত্যি সত্যি আপনাকে কেল্লায় পৌঁছুতে হয়, তাহলে গলিপথ দিয়ে আপনাকে গোপনে যমুনায় গিয়ে পৌঁছুতে হবে। যমুনা দিয়ে গিয়ে কেল্লার কোনও-না-কোনও দরজায় পৌঁছে যাবেন। এরপর যা কিছু করবার, তা আপনাকেই নিজের বুদ্ধিতে করতে হবে। যমুনার ঘাট পর্যন্ত পৌঁছুবার জন্য আমি আপনাকে বিশ্বস্ত লোক দেব।'

'আল্লাহ্ তোমার মঙ্গল করুন।'

পরিকল্পনামত কাজ হল। রতনচাঁদের বিশ্বস্ত লোক খাঁ সাহেবকে পৌঁছে দিয়ে এল কেল্লার কাছাকাছি যমুনার তীরে। আশা করা গিয়েছিল, সন্ধ্যা নাগাদ উনি ফিরে আসবেন। কিন্তু খাঁ সাহেব ফিরলেন না। আর পরেরদিন থেকেই ভয়ঙ্কর গোলমালে ভাসতে থাকল রাজধানী দিল্লি।

দুর্বার জনস্রোতেরমতো মারাঠা সৈনিকরা ঢুকে পড়ল শহরে। ভরে গেল বড়। বড় শাহী রাস্তা। ভরে গেল নগরের অলিগলি। এদের ছুটন্ত ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দে এবং অশোভন চিৎকারে কানে তালা-লাগবার জোগাড়। আরম্ভ হয়ে গেল লুঠতরাজ। প্রথমে দোকান-পাট। পরে গৃহস্থের বাড়ি। রতনচাঁদ তাড়াতাড়ি দোকানের ঝাঁপ ফেলে দিল। রাস্তার দিকের সব দরজা বন্ধ হল ভেতর থেকে। রতনচাঁদের কুঠির পিছন দিকে খানিকটা জঙ্গল। আরও পরে পোড়ো জমি। আবর্জনা ফেলার জায়গা। সেই পিছনের দরজা দিয়ে বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে থাকল রতনচাঁদের চাকর বাকররা।

ঘরে বসেই খবর পেতে থাকেন রতনচাঁদ।

লুঠতরাজে মারাঠীরা বরাবরই ছিল নিপুণ। সেই নিপুণতা দিল্লিতে ভালই দেখা গেল। টাকাপয়সা সোনাদানা ধনরত্ন, মহার্ঘ পোশাক, দামি দামি বিলাসদ্রব্য এবং সবরকমের খাবার দাবার। মেয়েদের গা থেকে কেড়ে নিল অলঙ্কার, ওড়না এবং শেষ পরিধেয় কাপড়টি। সুন্দরী মেয়েদের ইজ্জত নষ্ট হল। ইমানদার লোকেদের পিলখানা থেকে লুঠ হল হাতি, অশ্বশালা থেকে ঘোড়া। পারস্যদেশের গালিচা, কাশ্মীরী শাল, বারাণসীর রেশমি কাপড়, বাঙ্গলাদেশের মসলিন, মহিশূরের চন্দন, ইরানের সুগন্ধী আতর বাদ পড়ল না এদের লুণ্ঠনের সামগ্রী থেকে। এরসঙ্গে খুন-খারাপিতোআছেই। দিল্লি শ্মশান হয়ে গেল।

একদিকে মারাঠা সৈনিকদের অত্যাচার, অন্যদিকে গুজবে গুজবে রাজধানী তোলপাড়।

কখনও শোনা গেল, বাদশা ফারুকশিয়ার সৈয়দ ভাইদের বন্দি করে ফাটকের ভেতরে ঢুকিয়ে ফেলেছেন। তাদের বিচার চলছে। বড় বড় কাজীরা বসেছেন বিচার করতে। বিচারে মৃত্যুদণ্ড হবে। এ খবর প্রচারিত হবার কিছু পরেই বিপরীত খবর শোনা গেল। ফারুকশিয়ার প্রাসাদ ছেড়ে পালিয়ে গেছেন। কিংবা প্রাসাদের কোনও গোপন কক্ষে তিনি লুকিয়ে বসে আছেন। তাঁকে পাওয়া যাচ্ছে না। বেনিয়া রতনচাঁদের কাছে তার নোকর বাইরে থেকে ঘুরে এসে জানাল, 'হুজুর। হিন্দুস্তানের মুসলমানি রাজ খতম হো গিয়া।'

'মুঘলরা সব খতম হয়ে গেল? বলিস কিরে?'

হাঁ জি। ফারুকশেয়াল, হাসান-হুসেন, আকবর-শাজাহান, বিলকুল সব খতম হো গিয়া।'

'সব খতম। তা হলে রাজা হল কে রে?'

রাজা হল মারাঠীরা।'

সমস্ত গুজব শেষে একদিন লালকেল্লার প্রধান প্রবেশ পথে বিচিত্র এক মিছিল দেখা গেল। প্রধান রাজপথ জুড়ে ঐ মিছিল ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল কেল্লার দিকে। রাস্তার দু'ধারে দাঁড়িয়ে হাঁ করে কয়েক হাজার লোক এই দৃশ্য দেখছে।

মিছিলের একেবারে সামনে রয়েছে বিশাল এক হাতি। শুঁড় নাড়তে নাড়তে সে এগিয়ে চলেছে। হাতির পিঠে সুসজ্জিত হাওদা। হাওদার ওপর বসে আছেন হুজুর হুসেন আলি খাঁ। তাঁর মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত। তাঁর পিছনে সেনাপতি এনায়েত খাঁ সহ দশজন অশ্বারোহী। এঁদের পিছনে আরেকটি হাতি। সেই হাতির পিঠে বাদশাজাদা আকবরের পুত্র জোয়ান বখত! শাহী পোশাকে তিনি সুসজ্জিত। মাথায় রত্নখচিত রেশমি তাজ।

হাওদার মাথায় লাল চন্দ্রাতপ। শাহাজাদাকে দেখে রাস্তায় জনতা হাত নাড়ছে। প্রত্যুত্তরে শাহাজাদা হাত নেড়ে তাদের অভিনন্দন জানাচ্ছেন।

শাহাজাদার হাতির পিছনে সারি সারি চলেছে কয়েকটি পালকি। এই পালকিগুলির ভেতর একটিতে রয়েছে জুলেখা বিবি আর সেই কিশোরী আশমানি। এই পালকিগুলির পাশাপাশি খোলা তরবারি হাতে ঘোড়ার পিঠে চেপে চলেছে মিশিরলাল। হুজুর হুসেন আলির হিসাবরক্ষক। সেরেস্তাদার। জুলেখা বিবির ওপর নজর রাখবার দায়িত্ব তার। হুজুরের হুকুম।

দেশ জয় করে আসবার পর বিজয়ী সৈন্যেরা যে খাতির পায়, এঁরা সকলে তাই পেলেন। ভাই হুসেন আলি খাঁয়ের গলায় বড় একটি মোতির মালা পরিয়ে দিয়ে ভাইকে স্নেহভরে জড়িয়ে ধরলেন আবদুল্লা খাঁ। রাজপুত রাজা অজিত সিংহ এগিয়ে এসে কোলাকুলি করলেন খাঁ সাহেবের সঙ্গে। তিনিও একটি রত্নমালা পরিয়ে দিলেন খাঁ সাহেবের গলায়। হুসেন আলি খাঁ রাজা অজিত সিংয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনার শয়তান জামাই এখন কোথায়? দিল্লির বাদশাকে আপনি জামাই করেছেন, তা তাঁকে আপনি বাঁচাবেন না?'

রাজপুত রাজা হাসতে হাসতে বললেন, 'ঐ বিবাহের ঘটক ছিলেন তো আপনারাই! তখন ফারুকশিয়ারকে আপনারা পেয়ার করেননি? এখন আমার দিকে তাকালে কী হবে?

'করেছিলাম। পেয়ার করে ভুল করেছিলাম। নাই দিলে কুত্তা মাথায় ওঠে। সেই কুত্তাকে আজ মাথা থেকে নামাতে হবে। আশাকরি আপনার সহাযোগিতা পাব ।

'পাবেন।'

জন সমাগমে কেল্লা ভরে উঠল। মহলে মহলে ঠাসাঠাসি লোক। জেনানা মহলে মেয়েদের রাখা গেল না। বাদশা ফারুকশিয়ার আবার পিছু হাঁটতে হাঁটতে জেনানা মহলে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন। হাবশি খোজা আর তাতার কন্যারা হয়েছে মহলের পাহারাদার। বেগম আর বিবিরা এখন বাদশার পক্ষে। বেগমরা তরবারি নিয়ে বসে আছে মহলের দরজায়। বাঁদিদের হাতে বর্শা। ঐ সব প্রভাবশালিনী বিবি ও বেগমদের অতিক্রম করে কে যাবে ভেতরে? ঘাতকের পক্ষেও বিষয়টি লজ্জাজনক। আবদুল্লা খাঁ তাই বড়ো সঙ্কটে পড়েছেন। বাদশা ফারুককে কিছুতেই বাইরে বার করে আনতে পারছেন না।

ফলে পুরুষ মহলের ভেতরেই আলাদা করে কিছুটা অংশ বিবি মহল করা হল। আরও অনেক বিবির সঙ্গে পৃথক একটি কক্ষে ঠাই পেল জুলেখা আর আশমানি। এই কক্ষ থেকে অনতিদূরে রাখা হল নতুন শাহাজাদাকে। শাহাজাদার জন্য রাজকীয় আড়ম্বরের কোনও ত্রুটি রইল না।

আবদুল্লা খাঁ এবং হুসেন আলি খাঁ দু'জনেই রয়ে গেলেন কেল্লার ভেতর। কেল্লার বাইরেই তাঁদের বিরাট প্রাসাদ। সে প্রাসাদও শাহী প্রাসাদের মতো জমকালো। আরাম আনন্দের কিছু কমতি নেই। ইচ্ছা করলেই তাঁরা সেখানে যেতে পারতেন। কিন্তু এই গোলমালের ভেতর শিকার ছেড়ে তাঁরা বাইরে যেতে ভরসা পেলেন না।

এই ভাবে থাকতে থাকতে গড়িয়ে গেল বেশ কয়েকটি দিন। বাদশা ফারুকের লোমও তাঁরা স্পর্শ করতে পারলেন না।

আবদুল্লা খাঁ উত্তেজনায় ছটফট করতে থাকেন। পায়চারি করেন প্রাসাদ চত্বরে। আর বলেন, 'তীরে এসে বুঝি তরী ডুবে যাবে? আর ঐ তরী ডোবা আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখব?'

'ধৈর্য-ধরুন ভাইজান! সবুর করুন। জেনানা মহলে ঢুকে গিয়ে আমরা যদি বাদশাকে টেনে বের করে আনি, সে বড় কলঙ্ক হবে। তা ছাড়া তামাম হিন্দুস্তানে মুঘলদের ওপর একটা সহানুভূতি আছে। ছোটো বড় সব মুলুকদার, জায়গীরদার, মনসবদার আর দরবারি আমীররা মুঘলদের ভালোবাসে। এই মুহূর্তে বাদশা ফারুকের তারা বিরোধী হলেন, মুঘল হারেমের ওপর হামলা তারা বরদাস্ত করবে না। একটা গোলমাল মেটাতে গিয়ে আরেকটা গোলমালে জড়িয়ে পড়ব। ভুলে যেও না ভাই, আর যাই হই না কেন, মুঘলবংশের আমরা কেউ নই। যদি কিছু করতেই হয়, তা হলে একটা ঢাল দরকার।

'তার জন্যও হাতের কাছে শাহাজাদা জোয়ান বখ্‌ত তো রয়েছেই! আমরা তাকে তখ্‌তে বসিয়ে দেব। বাদশা ফারুক এসে বাধা দিক।'

'বেশ তাই হোক। জোয়ান বখ্‌তের বাদশা হওয়াটা আমরা আগাম প্রচার করে দিই।'

যেমন কথা, তেমন কাজ। পরেরদিন সকালেই রাজধানীর মোড়ে মোড়ে ডংকা বাজিয়ে ঘোষণা করা হল. বাদশা ফারুকশিয়ারকে সরিয়ে দিয়ে তখ্‌ত-ই-তাউসে বসানো হবে নতুন এক শাহাজাদাকে।শাহাজাদা জোয়ান বখতকে।

সৈয়দ ভাইদের এই ঘোষণা যথাসময়ে গিয়ে পৌঁছুল ফারুকশিয়ারের হাতে। ফারুক বললেন, 'আমি নতুন কোনও বাদশাকে মানি না। জীবন থাকতে আমি কোনও বাদশাকে মানব না।' বাইরে একথা প্রচারিত হল। ফারুক নিশ্চিন্তে জেনানা মহলে বসে রং মহলের বিবিদের গান শুনতে লাগলেন। পরিস্থিতির কোনও পরিবর্তন হল না। যেমন ঝুলে ছিল, তেমনিই ঝুলে রইল।

আবদুল্লা খাঁ বললেন, 'এ তো ভারি বিচ্ছিরি কাণ্ড হল! সমস্যার সমাধান কী ভাবে হবে?'

'ফারুককে খতম না করলে শাহী তখ্‌ত খালি হবে না। কী ভাবে খতম করা যায় তার উপায় ভাব।'

'কিন্তু কোনও উপায় তো দেখছি না!' গুম্‌ মেরে গেলেন আবদুল্লা।

'না দেখতে পেলে অপেক্ষা করো। সবুরে মেওয়া ফলে।'

এঁরা অপেক্ষা করতে থাকলেন। তবে ওৎ পেতে রইলেন সুযোগের অপেক্ষায়। শিকারীরা যেভাবে অপেক্ষা করে শিকারের জন্য, এঁরাও বসে রইলেন সেভাবে।

বিবি জুলেখার ভেতরেও সকলের আগোচরে চলল এই অপেক্ষার খেলা। মসনদ নয়, মনসবও নয়। লাখো টাকার কোনও ইনামও নয়, ভয়ঙ্কর একটি প্রতিশোধস্পৃহা তার মনের ভেতর খেলা করতে থাকল। কী ভাবে যে সে এগোবে, তা সে জানে না। মনের কথা খুলে বলে সে যে কারোর সঙ্গে পরামর্শ করবে, সে সুযোগও তার নেই! অথচ একটি পথ তাকে খুঁজে বের করতেই হবে। শাহাজাদা ফারুককে যে-ভাবে হোক গান শোনাতে হবে। নাচ দেখাতে হবে। তাকে মুগ্ধ করে চরম প্রতিশোধ নিতে হবে। জুলেখার বুকের ভেতর জ্বলতে থাকল ধিকিধিকি তুষের আগুন।

হাত গুটিয়ে চুপচাপ বসে থাকা স্বভাবে নেই হুজুর হুসেন আলি খাঁ কিংবা তাঁর দাদা আবদুল্লা খাঁর। তাই লড়াই করা যখন সম্ভব হল না, তখন ওঁরা নাচ-গানের মজলিশ বসালেন অবসর সময় কাটাতে। প্রতি সন্ধ্যায় বসতে থাকল মজলিশ। নাচ গান আর অঢেল শরাব। মারাঠা সৈনিকদের অত্যাচারে দিল্লি নগরী জর্জরিত। ও বিষয়ে সৈয়দভাইদের খেয়াল রইল না।

এ মজলিশে ডাক পড়ল একদিন জুলেখা বিবিরও। মেয়েটি যেমন সুন্দরী, তেমন লাস্যময়ী। রোজই তার নাচা ও গানা শুনে মজলিশ খুশ হতে থাকল। বিশেষত আবদুল্লা।

'এ চিড়িয়াকে কোথা থেকে জোগাড় করলে ভাই?'

'এ চিড়িয়া নিজেই এসে আমার কাছে ধরা দিয়েছে।' হা-হা করে হাসতে থাকলেন হুসেন আলি খাঁ।

'বিবির বিশেষ কোনও উদ্দেশ্য নেই তো?'

'সে শাহাজাদা কিংবা বাদশাজাদা—কোনও একজন রহিস লোককে গান শুনিয়ে জীবন সার্থক করতে চায়!'

'মাগী সম্ভবত সত্যি কথা বলেনি। আরও কিছু বড় ধান্ধা আছে বলে মনে হয়।'

'আমারও তাই মনে হয়। সেই জন্য সেরেস্তাদার মিশিরলালকে নজরদারি করতে বলেছি।'

'ভালই করেছ!'

একদিন সকালবেলায় শাহী বাগিচায় জুলেখা তখন বেড়াচ্ছে, ঠিক সেই সময় একটি বাঁদি এসে ফিসফিসিয়ে বলল, 'বাদশা ফারুকশিয়ার আপনার নাচ দেখতে চান! কথাটা পাঁচকান করবেন না।'

'তিনি আমার নাচের কথা জানলেন কেমন করে?'

'ফুল ফুটলে ভ্রমর যে-ভবে জানতে পারে, সেইভাবে জেনেছেন।'

যে সুযোগের অপেক্ষায় সে এতদিন ঘুরে বেড়াচ্ছিল, সে সুযোগ অচানক এসে গেছে তার হাতের কাছে। সে ফিসফিস করে বলল, 'বাদশা ফারুককে নাচ দেখাব , এমন সৌভাগ্য ক'জনের হয়! কিন্তু বিবি, তাঁর কাছে আমি যাব কেমন করে?'

'কৌশল করে আপনাকে আমরা নিয়ে যাব।'

'কখন নিয়ে যাবে?'

'কাল এমন সময়।'

'বেশ, আমি তৈরি থাকব।' হাসল জুলেখা, 'তবে সন্ধ্যার আগে কিন্তু ফেরৎ দিয়ে যেও।'

সেদিন দুপুরে খাওয়ার পর বিশ্রাম নিচ্ছিলেন হুসেন আলি খাঁ। ঘরটির পুবদিকে ঝরোকা। সেখান দিয়ে মৃদু ঠাণ্ডা বাতাস আসছে। আতরের গন্ধে ঘরটি মম করছে। সামান্য একটু তন্দ্রা এসেছিল খাঁ সাহেবের। এই সময় মিশিরলালকে নিয়ে হানা দিল জুলেখা।

'কে?'

'জুলেখা বিবি আপনাব সঙ্গে কথা বলতে চান।' মিশিরলাল এগিয়ে দিল জুলেখাকে। জুলেখা আম্‌তা আম্‌তা করে বলল, 'একটা শুভ খবর আছে জনাব! বাদশা ফারুক আমার নাচ দেখতে চেয়েছেন।'

'ফারুক নাচ দেখতে চেয়েছেন তোমার?' ভ্রূ কুঁচকে হুসেন বললেন 'এতো বড় মজার কথা!'

'মজার কথাই বটে! কিন্তু হুজুরেরা যদি অনুমতি করেন, তা হলে এটিকে আমি একটি সুযোগ হিসাবে ব্যবহার করতে পারি। কৌশল করে আমি টেনে বের করে আনতে পারি তাঁকে জেনানা মহল থেকে। তবে এ ব্যাপারে কিছু রণরঙ্গিণী তাতারণী দরকার।'

খাঁ সাহেবের ঘুম ছুটে গেল। বললেন, 'সব সহযোগিতা তুমি পাবে।'

সকলের অলক্ষ্যে লালকেল্লার ভেতর তখ্‌ত দখল নিয়ে যখন একটি পরিকল্পনা তৈরি হচ্ছে, তখন অনুরূপ একটি ছক তৈরি করার জন্য বেনিয়া রতনচাঁদেব বাড়িতে একটি গোপন পরামর্শ সভা বসল। ঠিক একই সময়ে। উদ্দেশ্য হল, লুঠেরা মারাঠাদের হাত থেকে কী ভাবে দিল্লি শহরকে বাঁচানো যায়। এ সভায় আরও পাঁচজন বেনিয়া হাজির। হাজির কয়েকজন দরবারি লোকও। দরবারি হানিফ খাঁ বললেন, 'শাহি শক্তি যদি ঘুমিয়ে থাকে, তাহলে

দেশে এমন অরাজকতাই হয়। লুঠেরাদের বাধা দেবারও কেউ নেই।'

বেনিয়া শুকচাঁদ বললেন, 'আমরা যদি সকলে কোতোয়ালিতে যাই, তাহলেও কোনও কাজ হবে না?'

'না। কোটাল মশাই পালিয়ে গেছেন।'

'ত হলে চলুন আমরা বাদশার কাছে গিয়ে নালিশ করি।'

'বাদশা ফারুক বন্দি হয়ে আছেন কেল্লার ভেতর। দেখা মিলবে না। সুতরাং নালিশ করা বৃথা!'

'তা হলে আমরা কার কাছে যাব? কে আমাদের রক্ষা করবে? উজির আবদুল্লা খাঁয়ের কাছে গেলে কেমন হয়?'

'আবদুল্লা খাঁ?' দরবারি হানিফ হেসে উঠলেন, 'তিনি এখন এক নতুন শাহাজাদাকে তখ্‌তে বসাবার জন্য হাঁ করে বসে আছেন। তা ছাড়া মারাঠা আর রাজপুতদের সাহায্য নিয়ে তিনি বাদশা ফারুককে উচ্ছেদ করতে চান। মারাঠাদের লুঠ করবার অধিকার তিনি মেনে নিয়েছেন। তাই এদের ঠেকাতে যাবেন তিনি কোন দুঃখে?'

'তা হলে আমরা কোথায় যাব! বাঁচব কী করে?' ককিয়ে উঠল বেনিয়া রতনচাঁদ।

হানিফ খাঁ বললেন, 'বাঁচতে হলে আমাদের বাহুবলেই বাঁচতে হবে। আস্থা রাখতে হবে নিজেদের তাকতের ওপর। আমাদের হাতের কাছে দা, কুড়ুল, লাঠি, শোটা যা আছে, তাই দিয়ে লুঠেরাদের মুখোমুখি হতে হবে। ভয়ে পিছু হাঁটলে চলবে না। মেয়েরা নামুক হাতা-খুন্তি- ঝাড়ু নিয়ে। এরপর দেখা যাবে, কী হয়!'

শেষপর্যন্ত হানিফ খাঁয়ের পরামর্শই গ্রাহ্য হল। মহলে মহলে ছড়িয়ে পড়ল হানিফ খাঁয়ের কথা। দিল্লির নগরবাসীরা রুখে দাঁড়ালেন লুঠেরাদের। পদে পদে লুঠেরারা বিপন্ন হতে থাকল। আচমকা লঙ্কার গুঁড়োয় কয়েকজন মারাঠী সৈনিক অন্ধ হয়ে গেল। ওপর থেকে ছোঁড়া শাবলের ঘায়ে মারা পরল কয়েকজন লুঠেরা। মেয়েদের হাতে খ্যাংরা পেটা হল কয়েকজন। বেশ কিছু লুঠেরা পুড়ে মরল, মারাঠি সৈনিকরা জঙ্গল যুদ্ধে অজেয়, পাহাড়ের লড়াই তারা বোঝে। কিন্তু অচেনা নগরের অলিগলি তাদের কাছে বিপদসঙ্কুল হয়ে দাঁড়াল।

যমুনার পারে তাঁবু গেড়ে বসে আছেন পেশোয়া বালাজী ভাট। মারাঠাদের বিপদের কথা তাঁর কাছে গিয়ে পৌঁছুল।

বালাজী হুকুম দিলেন, 'সৈনিকদের ফিরিয়ে নিয়ে এসো। খেসারৎ যা আদায় করবার, তা আমরা সৈয়দ ভাইদের কাছেই আদায় করব।'

এইভাবে দিল্লির জীবনযাত্রা স্বাভাবিক হয়ে আসতে থাকল একটু একটু করে। রতনচাঁদ আবার ঝাঁপ খুলল তার দোকানের। তবে একান্ত ভয়ে ভয়ে।

কিন্তু শহরের কেন্দ্রবিন্দু লালকেল্লা তখনও অস্থির। উদ্বেল। শাহাজাদা জোয়ান বখ্ত এই গোলমালের ভেতর থেকেও বড় নিঃসঙ্গ। সেই রেশমি আর গোলাপি এখনও রয়েছে তার পরিচারিকা হয়ে। মাঝে মাঝে আশমানি এসে তাকে গান শুনিয়ে যায়। আশমানি মেয়েটি বড় অবোধ। বড় শান্ত। খুব কম কথা বলে। তার মুখে যেন কোনও ভাষা নেই। তার যা কিছু ভাষা, তা তার ঐ চোখে।

একদিন গান শোনাবার পর আশমানিকে জোয়ান বখ্ত বলল, 'এ পাথুরে প্রাসাদ তোমার কেমন লাগছে?'

'ভাল না।'

'এত আরাম, এত সাজসজ্জা, আতরের গন্ধ, কোমল বিছানা, নরম দামি গালিচা—এসব তোমার ভাল লাগে না?'

'না।'

'সারা জীবন যদি এখানে কাটাতে হয়, পারবে না কাটাতে?'

'না।'

'দু'দিন পরে আমি শাহী তখ্তে বসব। আমাকে তখন গান শোনাবে কে?'

'আমি ছাড়া আর কেউ। আমি আপনার কাছ থেকে ছুটি নেব।'

'যদি ছুটি না দিই?'

আশমানি কোনও উত্তর দিল না। তার বড় বড় চোখদুটিতে কিসের যেন ছায়া নামল।

'যদি তোমাকে আমি শাদি করি, বেগম করি। তখনও তুমি আমার কাছ থেকে ছুটি চাইবে?'

আশমানি ঘাড় নিচু করে কী যেন একটু ভাবল। তারপর 'জানি না' বলেই এক দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

এদিকে রেশমি বিবির মুখে খই ফুটছে। তার মুখে রোজ নিত্যি নতুন খবর। একেবারে তরতাজা। একদিন দুপুরে এসে বলল, 'শাহাজাদা। খবর শুনেছেন? নাচনি বিবি জুলেখা বাঈ তাঁর মহল থেকে চুরি হয়ে গেছেন! বিলকুল চুরি। বাদশা ফারুকের তাতারক্ষীরা বিবিকে চুরি করে নিয়ে গেছে তাদের জেনানা মহলে। বাদশা নাকি তাকে শাদি করবে।'

'শাদি?' বিষণ্ণ জোয়ান বখ্ত হেসে ফেলল শাদির কথায়। 'মরণের মুখে দাঁড়িয়ে লোকটা শাদি করতে চাইছে! তোমাদের বাদশাকে আমার একবার দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে।'

'দেখবেন আপনি? সত্যি?' শাহাজাদার কথা লুফে নিয়ে বলল রেশমি, 'তা হলে আজ সন্ধ্যাতেই তাঁর দেখা পাবেন। তবে পুরুষবেশে নয়। একটা বোরখা পরে নিতে হবে।'

রেশমির কথা শুনে জোয়ান বখ্ত মজা পেল। তবে এমন মজাদার কথা

হামেশাই বলে থাকে রেশমি। তাই তার কথায় তেমন গুরুত্ব দিতে পারল না জোয়ান বখ্‌ত। ভুলে গেল। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর সে একটানা তিন-চার ঘণ্টা ঘুমিয়ে নিল। ঘুম থেকে উঠে একটি কেতাব নিয়ে খানিক নাড়াচাড়া করল। যমুনাতীরের ঝরোখা দিয়ে বাইরের জগৎকে সে একবার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকল। যমুনার ওপারের জন-জীবন শান্ত। নদীর চড়ায় গোরু চরছে। জেলেরা মাছ ধরছে। একটি গো-শকট ধীরগতিতে এগিয়ে চলেছে গ্রামের দিকে। দূরে গাছ-গাছালির আড়ালে গ্রাম। দূরবীণ দিয়ে গ্রামের চালাঘরগুলিও গাছের ফাঁক দিয়ে দেখা যায়। এই সব দেখতে দেখতে জোয়ান বখ্‌তের মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল। বিকেলের হলুদ রোদ্দুর নামল নদীর চড়ায়। জোয়ান বখ্‌ত বাগানে বেড়াতে নামল।

'শাহাদাজা, আপনি এখানে?' বাগিচার ভেতর থেকে উঠে এল আশমানি।

ঠিক সেই সময়ে বাতাসে ভেসে আসতে থাকল ক্ষীণ মঞ্জীর-ধ্বনি। নাচের তালে তালে বাজনার শব্দ। আর সুরেলা এক নারীকণ্ঠের আওয়াজ। কণ্ঠস্বর শুনে বোঝা গেল, এ গান বন্দি জুলেখার।

জুলেখার গলা শোনার সঙ্গে সঙ্গে রেশমির কথা মনে পড়ে গেল জোয়ান বখ্‌তের। আশমানির দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'তোমার বোরখাটা পরে নাও আশমানি। তাড়াতাড়ি। আমিও একটা বোরখা পরে নেব।'

প্রাসাদের ভেতরে ঢোকবার পরেই জোয়ান বখ্‌ত কেমন যেন এক অদ্ভুত পরিস্থিতির আঁচ পেল। দু'একটি জায়গা ছাড়া প্রাসাদের ভেতর কোথাও আলো জ্বালা হয়নি। আবছা এক আবর্তে পাক খাচ্ছে সকলে। চাপা গলায় কথা বলছে সকলে। চেনা যায় না কে রক্ষী, কে পাহারাদার। চেনা যায় না আপন-পর। এমন কী কে মরদ, কে মর্দানা তাও ঠাহর করা যায় না। বেশির ভাগ মানুষই বোরখা-পরা। যারা বোরখা-পরা নয়, তাঁদের মুখে কালো পট্টি বাঁধা। পট্টির ওপর শুধু এক জোড়া চোখ জেগে আছে। প্রাসাদের অলিন্দে-চত্বরে, কক্ষে-চবুতরে পাক খাচ্ছে ঘোলা জলের ঢেউ। বাতাসে খুনের গন্ধ। কে যেন কার কানে কানে কী বলে গেল।

জেনানা মহলের রাস্তাটা জোয়ান বখত একদমই চেনে না। আশমানি চেনে। আশমানি তাকে হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে গেল। অনেক সিঁড়ি ভাঙতে হল। মেলা অলিন্দ অতিক্রম করতে হল। আলো না-থাকার জন্য হোঁচট খেতে হল। শেষে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল বিরাট এক কক্ষের দরজার সামনে। ঘরে মাথার ওপর বিশখানা ঝাড়বাতি জ্বলছে। দেওয়ালে অজস্র আয়না গাঁথা। সেই ছোটো আয়নায় এক ঝাড়বাতি, হাজার হয়ে অলৌকিক আলো ছড়াচ্ছে।

মেঝেতে গালিচা পাতা। লাল কোমল গালিচা। কক্ষের এক প্রান্তে মোটা গদির ওপর তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসে আছেন এক শীর্ণকায় যুবক। যুবক দেখতে সুশ্রী। কিন্তু চোখের কোল জুড়ে কালি পড়েছে। দেখলেই বোঝা যায় ভোগের অত্যাচারে শ্রান্ত। অবসন্ন।

আশমানি ফিস্ ফিস্ করে বলল, 'উনিই হলেন বাদশা। বাদশা ফারুকশিয়ার।'

ফারুকশিয়ার? সর্বাঙ্গ শিহরিত হল জোয়ান বখ্‌তের। এই মানুষটিকে সরিয়ে সে তখ্‌তে বসবে? উনিই এখন হিন্দুস্তানের বাদশা!

ফারুক বসে আছেন মখমলের তাকিয়া ঠেস দিয়ে। স্ফটিক পাত্রে টলমল করছে লাল শরাব। সেই শরাবে মাঝে মাঝে গলা ভিজিয়ে নিচ্ছেন আর নাচ দেখছেন বাঈজীর। ঐ লাস্যময়ী বাঈজী আর কেউ নয়, জুলেখা। জুলেখা বাঈয়ের সর্বাঙ্গ হিরে-মাণিকে মোড়া। ওড়নায় হিরের চুমকি। গলায় মোতির হার। কানে হিরের দুল। হাতে-মণিবন্ধে- আঙুলে—সর্বত্র হিরে-মুক্তোর ছড়াছড়ি। কক্ষের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত প্রবল উচ্ছ্বাসে নেচে চলেছেন জুলেখা বাঈ। জোয়ান বখ্‌তের হঠাৎ মনে হল, সে এক নির্জন পাহাড়ি জঙ্গলে দাঁড়িয়ে আছে। সামনে এক চিলতে খোলা মাঠ। সেই মাঠে ফণা তুলে দৌড়াদৌড়ি করছে এক ভয়ঙ্কর নাগিনী। এখনই সে ছোবল মারবে।

'বাদশা! হজরত! ফারুকশিয়ার! এই বাঁদিকে আপনি চিনতে পারেন?'

হঠাৎ নাচ থামিয়ে বাদশার মুখোমুখি গিয়ে বসেছে জুলেখাবিবি। ঢলঢল দুটি চোখ মেলে ধরেছে সে বাদশার সামনে।

'কী জানি, ঠিক বুঝতে পারছি না? তবে চেনা চেনা লাগছে!'

'হা কপাল! চেনা চেনা লাগছে? কাজী ইব্রাহিম খাঁয়ের মেয়ে আনারকলিকে আপনি চিনতে পারছেন না। একটি অবোধ কিশোরীকে লুঠ করে নিয়ে গিয়ে তার সর্বনাশ করেছিলেন, সে অতীতকে আপনার মনেই পড়ছে না?'

'আনারকলি! তুমিই সে?'

'হ্যাঁ, আমিই সে আনারকলি। রোটাক দুর্গে যাকে নিয়ে গিয়ে ছ'মাস আটক করে মজা লুটেছিলেন, তারপর একদিন এঁটো পাতারমতোছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। তা, যে চোখ দিয়ে আপনি আমার রূপ দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন, সেই চোখে আমি আজ একবার সুরমা পরিয়ে দিতে চাই! জনাব! হজরত। হিন্দুস্তানের বাদশা ফারুকশিয়ার, আপনার তাতে কোনও আপত্তি আছে?'

'আপনি?' আম্‌তা আম্‌তা করে বললেন, 'তুমি যদি আমাকে সুরমা পরিয়ে দিতে চাও, তাতে আপত্তি থাকার কথা নয়।' বাদশা ফারুকশিয়ার নিজেকে আপ্রাণ সহজ করার চেষ্টা করলেন। কটিবন্ধের থেকে লুকিয়ে রাখা

ছোট্ট একটি সোনার সুরমাদানি বের করল জুলেখা। বার করল সোনার একটি ছোট্ট শলাকা। সেই শলাকায় সুরমা লাগিয়ে তার হাত দুটিকে সযত্নে এগিয়ে নিয়ে গেল ফারুকশিয়ারের চোখের কাছে। কালি পড়েছে চোখের কোন জুড়ে। ভারি অসহায় দৃষ্টি।

জোয়ান বখ্‌তের চোখের সামনে তখন সেই সাপের দৃশ্য। পাহাড়ি সাপ। এক চিলতে সবুজ জমির ওপর ফণা তুলে সাপটি এবার গজরাচ্ছে। গজরাতে গজরাতে হঠাৎ সে তীব্রতর এক হিস্ হিস্ শব্দ করে পাথরের ওপর ছোবল মারল। ভয়ঙ্কর সেই দৃশ্য দেখে জোয়ান বখ্‌ত চোখ বুজে ফেলল।

চোখ বোজার সঙ্গে সঙ্গে ভয়ঙ্কর এক আর্তচিৎকারে কেঁপে উঠল শীস্‌মহল। পরপর দুটি ছোবল। সুরমা পরার ছোট্ট শলাকাটি ঢুকে গেছে চোখের গভীরে। পরপর দুটি আঘাত। দুটি চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়তে থাকল লাল খুন। বাদশা ফারুকের আর্তচিৎকারে পাহারাদার তাতাবানীরা ধরতে গেল জুলেখা বাঈকে। তার আগে ল্যাঠি মেরে কারা যেন আলো নিভিয়ে দিল। ঝাড়বাতির ওপর পড়তে থাকল লাঠির পর লাঠি। চারদিকে কেবল শোনা যেতে থাকল ভাঙার শব্দ। ঝন্ ঝন্। ঝন-ঝনাৎ। এই সঙ্গে মিশল মেয়েদের কান্নার শব্দ। আর্ত কলরব। আরম্ভ হয়ে গেল দৌড়াদৌড়ি।

ঘোর অন্ধকারের ভেতর কে কোথায় ছিট্‌কে গেল, তা বোঝা গেল না। বাদশা ফারুকশিয়ারকে কারা যেন টানতে টানতে নিয়ে গেল ভেতরের দিকে।

ঐ অন্ধকারের ভেতর আশমানির হাত ধরে অসহায়ভাবে দৌড়ুতে থাকল জোয়ান বখ্‌ত। কোথায় চলল, তা সে ঠাহর করতে পারল না। তবে কেল্লার ভেতর দিয়ে সে অনেকখানি দৌড়ুল। বিস্তর সিঁড়ি ভাঙল। নিচু নিচু অবরোধ টপকাল। এক মহল পেরিয়ে চলে গেল আরেক মহলে। হোঁচট খেল। ধাক্কা খেল। তবু আশমানির হাত সে দৃঢ় হাতে ধরে রইল।

ঘণ্টা দেড় দুই পরে জোয়ান বখ্‌তের মনে হল, তারা একটি ঘাটের কাছে এসে পৌঁছেছে। জায়গাটি নির্জন। সামনে নদী।

'এ আমরা কোথায় এলাম আশমানি?'

'জানি না।'

'যমুনার ঘাট বলে মনে হচ্ছে।'

'হয়ত তাই হবে।'

শরীরে, মনে এতই পরিশ্রান্ত ছিল যে আর কেউ কোনও কথা বলতে পারল না। দু'জনে দু'জনের গায়ে হেলান দিয়ে প্রথমে বসল, তারপর পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়ল। আকাশের বুকে জ্বল জ্বল করতে থাকল রাশি রাশি নক্ষত্র। এবং সেই ভূতুড়ে পুরনো চাঁদ।

রোজ যেমন সকাল হয়, পরেরদিনও ঠিক সেইভাবে সকাল হল। কোনও ব্যতিক্রম দেখা গেল না। যমুনার বুকে পদ্মকোরকের মতো জেগে উঠল কুসুম কুসুম এক ভোর। নদীর জলে ছড়িয়ে পড়ল সকালের আলো। ফজরের নামাজ সেরে ইব্রাহিম খাঁ এসে দাঁড়ালেন বৃদ্ধ 'কাজী-উল-কাজাতে'র কাছে। আদাব জানিয়ে বললেন, 'এবার বান্দাকে ছুটি দিন, হজরত। আমার পাওনা-গণ্ডা মিটে গেছে। শুনছি গত রাতে খুন হয়েছেন বাদশা ফারুক। রাজধানীতে এখন কোনও গোলমাল নেই। দিল্লি শান্ত। এই ফাঁকে আমি এ নগর ছেড়ে চলে যেতে চাই! এ দোজখে আমি আর থাকতে চাই না।'

বৃদ্ধ কাজী বললেন, 'ঠিকই বলেছ ভাই! এ নগর এখন সত্যি সত্যিই দোজখ্। শোনো, নদীর ঘাটে তোমার জন্য নৌকো বাঁধা আছে। ঐ নৌকো ধরেই তুমি ওপারে চলে যাও।'

ইব্রাহিম খাঁ আর দাঁড়ালেন না। কাজীর নির্দেশিত পথ ধরে কেল্লার ঘাটে গিয়ে হাজির হলেন। এসে দেখলেন, ঘাটের অনাবৃত শিলার ওপর শুয়ে রয়েছে তাঁর ছেলে জোয়ান বখ্‌ত এবং পাশে একটি কুসুম কোমল মেয়ে। দেখে ইব্রাহিম খাঁ বিহ্বল হয়ে পড়লেন। তাঁর ছেলে আজও বেঁচে আছে? বখ্‌ত তাহলে বাঘের পেটে যায়নি! কিন্তু এই কেল্লার ঘাটে সে কী করে? চোখ জলে ভেসে গেলেও খাঁ সাহেব কিন্তু আর দাঁড়ালেন না। তিনি আর মায়া বাড়াতে চান না। মক্কা যাওয়া যখন স্থির করেছেন, তখন তিনি আর পিছু ফিরে তাকাবেন না। কিন্তু মেয়েটিই কে? জোয়ান বখ্‌ত শাদি করেছে? আহা, ওরা সুখী হোক। জোয়ান বখ্‌ত সংসারী হোক।

দ্রুত পায়ে সিঁড়ি ভেঙে নিচে নামতে থাকলেন ইব্রাহিম খাঁ। সামনেই নৌকো। ছেলের অগোচরে তিনি চলে যেতে চান।

কিন্তু তা হল না। সিঁড়ির শেষ ধাপে নামবার আগেই গোলমাল হয়ে গেল। পায়ের এটুকু শব্দেই ঘুম ভেঙে গেছে বজ্জাত ছেলের।

'আব্বাজান!'

পিছু ফিরে তাকালেন ইব্রাহিম খাঁ।

ওরা দ্রুত নেমে আসছে। জোয়ান বখ্‌তের চোখেমুখে উদ্‌ভ্রান্তি।

'কোথায় যাচ্ছ? আমরাও যাব তোমার সঙ্গে।'

'বটে!' থম্‌কে দাঁড়ালেন ইব্রাহিম খাঁ।

'হ্যাঁ বাবা। অস্ফুট স্বরে বলে উঠল মেয়েটি।

নৌকো ভাসল। ভাসল তিনজনকে নিয়ে। ভাসতে ভাসতে এগিয়ে চলল আগ্রার দিকে। কিছুক্ষণ পরে ইব্রাহিম খাঁ ঘোষণা করলেন, 'জোয়ান বখ্‌ত! আমি চলেছি মক্কার পথে। আমার এ সংকল্পের কোনও নড়চড় হবে না।

আরও ঘণ্টাখানেক আমি তোমাদের সঙ্গে আছি, তার বেশি নয়। তা তোমরা কোথায় যাবে বলো?'

'কোথায় যাব?' উদ্‌ভ্রান্ত জোয়ান বখ্‌ত বলল 'জানি না। তাহলে আপনার সঙ্গে আমরাও নেমে পড়ব। তারপর অন্য কোথাও চলে যাব। কোনও মতেই দিল্লি ফিরে যাব না।'

দুপুর নাগাদ ওঁরা সকলে এসে পৌঁছুল একটি গঞ্জের কাছে। গঞ্জের ভেতর অনেক লোকের ভিড়। সেই ভিড়ের ভেতর কোতোয়ালির পোশাক-পরা একটি লোক ডংকা বাজিয়ে বাজিয়ে কী যেন ঘোষণা করছে। হাত নেড়ে নেড়ে মেলা কথা কিছু বলছে। ইব্রাহিম খাঁ এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কিসের জন্য ডংকা বাজাচ্ছো ভাই?'

'পুরস্কার ঘোষণা করছি জনাব!'

'পুরস্কার! ইনাম! কিসের ইনাম!'

'কেল্লা থেকে গত রাতে এক শাহাজাদা পালিয়ে গেছেন। তাঁর বাদশা হবার কথা ছিল। কারোকে কোনও কথা না-বলে তিনি নিখোঁজ হয়েছেন। তেনার খবর কোতোয়ালিতে দিতে পারলে হাজার তঙ্কা পুরস্কার।' আবার ডঙ্কা বাজল, ড্যাং ড্যাং। ড্যাং ড্যাং।

ইব্রাহিম খাঁ ছেলের মাথায় হাত রাখলেন। তারপর দ্রুত নিজের পথ ধরলেন।

জোয়ান বখ্‌ত খানিক হতভম্ব দাঁড়িয়ে রইল। তার বুকের ভেতরটা দুর দুর করতে থাকল। কী করবে সে? দৌড় দেবে?

হঠাৎ দেখল তার হাত ধরেছে লাজুক মেয়েটি। আশমানি জোয়ান বখ্‌তের অবস্থাটা আঁচ করে বলল, 'অমন হাঁ করে দেখছ কী! চলো, গ্রামের ভেতর ঢুকে পড়ি। শহরে আর নয়।'

'সেই ভাল।' জোয়ান বখ্‌ত আর দাঁড়িয়ে না থেকে গ্রামের দিকের রাস্তা ধরল। পিছনে আশমানি। কিন্তু তার পিছন দিকে ওরা আর ফিরেও তাকাল না।

[সমাপ্ত]